মুহম্মদ জাফর ইকবাল
নিঃসঙ্গ
বচন

দ্বিতীয় প্রকাশ
ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮
প্রথম প্রকাশ
অমর একুশে গ্রন্থমেলা '৯৮

©
ইয়াসমীন হক

প্রকাশক
শরীফ হাসান তরফদার
জ্ঞানকোষ প্রকাশনী
৩৮/২ বাংলাবাজার
ঢাকা-১১০০

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

অক্ষর বিন্যাস
ফয়েজ কম্পিউটার্স
৩৮ বাংলাবাজার
ঢাকা-১১০০

মুদ্রণ
এস. আর. প্রিন্টিং প্রেস
৭ শ্যামাপ্রসাদ চৌধুরী লেন
ঢাকা ১১০০

মূল্য : ৫৫ টাকা

উৎসর্গ

মিসেস হাসনা হক

শ্রদ্ধাস্পদেষু

(যিনি একই সাথে আমার লেখা নিয়ে আশাবাদী এবং চিন্তিত।)

ভূমিকা

এক বৎসরেরও বেশি সময় আগে রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ পড়াশোনার স্বার্থে সাময়িকভাবে হলেও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে ছাত্র রাজনীতি বন্ধ রাখার পক্ষে কথা বলেছিলেন। আমি আশা করেছিলাম দেশের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী বুদ্ধিজীবী, শিক্ষক এবং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ রাষ্ট্রপতির বক্তব্যের সমর্থনে কিছু বক্তব্য রাখবেন। আমি সবিস্ময়ে আবিষ্কার করলাম বাস্তবে সেটি ঘটল না, বরং তার বক্তব্যের বিরোধিতা করে ছাত্র রাজনীতির প্রয়োজনীয়তার উপরে বিভিন্ন কাগজে লেখালেখি হল। আমি তখন প্রায় মরীয়া হয়ে রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের বক্তব্যকে সমর্থন করে "আমাদের ছেলেমেয়েদের ফিরিয়ে দাও" নামে ভোরের কাগজে একটি লেখা লিখেছিলাম। খবরের কাগজের উপসম্পাদকীয় জাতীয় লেখাগুলি আদৌ কেউ পড়ে বলে আমার ধারণা ছিল না, কিন্তু আমি আশ্চর্য হয়ে আবিষ্কার করেছিলাম দেশের বুদ্ধিজীবী, শিক্ষক বা রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের প্রচলিত বিশ্বাসের বিরোধী এই লেখাটি অসংখ্য মানুষ পড়েছিল। তাদের অনেকে চিঠি লিখে আমাকে ধন্যবাদ জানিয়েছিলেন, ছাত্র-ছাত্রী এবং অভিভাবকদের অনেকে আমার বক্তব্যের সমর্থনে পত্র-পত্রিকায় লেখালেখিও করেছেন। শুধু তাই নয়, দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক বড় বড় শিক্ষাবিদ গোপনে আমাকে এই লেখাটির জন্যে অভিনন্দিত করলেও প্রকাশ্যে এই স্পর্শকাতর বিষয়টি নিয়ে একটি কথাও বলতে রাজী হননি। বুদ্ধিজীবীদের কেউ কেউ আমাকে সমস্যার গভীরে গিয়ে প্রকৃত দোষীদের চিহ্নিত না করার জন্যে মৃদুভাবে তিরস্কার করেছিলেন। তাদের তিরস্কারে খানিকটা সত্যতা ছিল বলে আমি পরবর্তীতে "আমি অভিশাপ দিই" নামে একটি লেখায় ছাত্র রাজনীতির বর্তমান ভয়ংকর রূপটির জন্যে সরাসরি রাজনৈতিক দলগুলিকে দোষী সাব্যস্ত করেছিলাম। কোন-একটি বিচিত্র কারণে এই লেখাটিও সাধারণ পাঠক অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন।

আমি এ যাবতকাল মূলতঃ কিশোর-কিশোরী বা শিশুদের জন্যে লিখে এসেছি। দেশের বা সমাজের সাম্প্রতিক সমস্যার মত গুরুতর বিষয় নিয়ে আলোচনা করার অভিজ্ঞতা না থাকায় আমি ভোরের কাগজে লেখাগুলি একেবারে সাধারণ মানুষের দৃষ্টিকোণ থেকে লিখেছিলাম। সাধারণ পাঠকের সাড়া দেখে মনে হয়েছে যে হয়তো সাধারণ মানুষের অবস্থান থেকেই আমার আরো কিছু লেখালেখি করা প্রয়োজন। 'বোদ্ধা' পাঠকদের কেউ কেউ আমাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন দীর্ঘদিন দেশের বাইরে থাকার কারণে আমি বর্তমান বাস্তব অবস্থার সাথে পরিচিত নই, আমি খানিকটা naive, আমি অনেক সময়ই আমার নিজের ছেলেমানুষি কল্পনার জগতে বাস করি এবং আমার লেখাগুলি 'সায়েন্স ফিকশানের' কাছাকাছি এক ধরনের ফিকশান ছাড়া কিছু নয়। আমি তাদের সমস্ত অভিযোগ মাথা পেতে নিয়েই এই অবস্থানে থেকেই আমার মনের ক্ষোভ বা আহ্লাদটুকু দশজনের কাছে প্রকাশ করব বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছি। ভোরের কাগজ কর্তৃপক্ষ আমাকে "নিঃসঙ্গ বচন" নামে এই আধা-নিয়মিত কলামটি লেখার সুযোগ করে দিয়েছেন বলে আমি তাদের কাছে কৃতজ্ঞ।

এই গ্রন্থে ভোরের কাগজে প্রকাশিত আমার বিভিন্ন কলামগুলি সংকলিত করে প্রকাশিত হল। কোন কোন কলামে আমি দেশের বড় বড় institution-কে সমালোচনা করেছি এবং সবিস্ময়ে আবিষ্কার করেছি তারা আমার (খানিকটা অপ্রয়োজনীয়ভাবে আবেগতাড়িত) সমালোচনা ধৈর্যের সাথে সহ্য করেছেন। সমালোচনা করার অধিকার এবং সমালোচনা সহ্য করার শক্তি—এই দুই-ই দেশের গণতন্ত্রের বড় চালিকাশক্তি। আমাদের দেশে এই কালচারটি গড়ে উঠেছে আবিষ্কার করে আমি আমাদের দেশ সম্পর্কে অত্যন্ত আশাবাদী হয়ে উঠেছি।

মুহম্মদ জাফর ইকবাল
২৭ শে জানুয়ারি ১৯৯৮
পল্লবী, ঢাকা।

সূচিপত্র

- আমাদের ছেলেমেয়েদের ফিরিয়ে দাও ১১
- পঁচিশ বছর পর ২১
- আমি অভিশাপ দিই ৩০
- লাল নীল শিক্ষক ৪০
- টেলিভিশন বিক্রি হবে ৪৬
- আমরা আন্দামানবাসী ৫৪
- তাদের ঘরে থাকবো না ৬০
- আমার কোচপানা জানবেন ৬৮
- পঁচাত্তরের বীজ ৭৫
- 'মাইনাসে মাইনাসে প্লাস' ৮২

জ্ঞানকোষ প্রকাশিত লেখকের অন্যান্য বই

- ওমিক্রনিক রূপান্তর
- প্রেত
- দেখা আলো না দেখা রূপ
- মহাকাশে মহাত্রাস
- ছেলেমানুষী
- আকাশ বাড়িয়ে দাও
- জারুল চৌধুরীর মানিকজোড়
- টি-রেক্সের সন্ধানে
- বিজ্ঞানের একশ মজার খেলা
- কপোট্রনিক সুখ-দুঃখ
- বিজ্ঞানী সফদর আলীর মহা মহা আবিষ্কার
- কিশোর উপন্যাস সমগ্র

আমাদের ছেলেমেয়েদের ফিরিয়ে দাও

আমি প্রায় আঠারো বছর দেশের বাইরে থেকে বছর দুয়েক আগে একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতার চাকরি নিয়ে দেশে ফিরে এসেছি। চাকরিতে যোগ দেওয়ার আগে এক বাসায় কিছু মানুষের সঙ্গে দেখা। সেখানে একজন সাংবাদিক আমার কাছে যুক্তরাষ্ট্রের নিশ্চিন্ত নিরাপদ আশ্রয় ছেড়ে দেশে ফিরে আসার কারণ জানতে চাইলেন। মনে হয় এ ধরনের ব্যাপারে গোপন এজেন্ডা থাকে, আমার ছিল না। আমি সত্যি কথাটাই বললাম, তাকে জানালাম আমি দেশে ছাত্র পড়াতে এসেছি। সাংবাদিক ভদ্রলোক খানিকক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থেকে তার মুখের শ্লেষের হাসিটি গোপন রাখার বিশেষ চেষ্টা না করে বললেন, আপনি অত্যন্ত নাইভ (naive)।

'নাইভ' শব্দটির ভালো বাংলা প্রতিশব্দ নেই। ডিকশনারিতে এর প্রতিশব্দ হিসেবে 'সরল' অথবা 'অকপট' লেখা হলেও এর সত্যিকার অর্থ ভিন্ন। কেউ যদি একটা গুরুত্বপূর্ণ বা জটিল ব্যাপারের গূঢ় অর্থ বুঝতে না পেরে তার সাদাসিধে, হাস্যকর বা ছেলেমানুষি ব্যাখ্যা দেয় তখন তাকে নাইভ বলা যায়। নাইভ বিশেষণটি প্রশংসা নয়, এটি অপমানসূচক কথা। আমার যেটুকু অপমানিত বোধ করার কথা ছিল আমি ততোটুকু করিনি, কারণ আমাকে এর আগেও অনেকে এটা বলেছে এবং আমার ধারণা কথাটি সত্যি। আমি যে নাইভ, তার বড়ো প্রমাণ আমার এই লেখা। একজন অভিজ্ঞ, চিন্তাশীল বুদ্ধিমান ব্যক্তি সম্ভবত এ ধরনের লেখা কাগজে লিখবেন না। আমি লিখছি, কারণ কাউকে-না-কাউকে লিখতে হবে। বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি—এ দেশের সবচেয়ে শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিদের একজন, বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ এই ব্যাপারটি নিয়ে একটি উক্তি করেছেন। উক্তিটির পক্ষে এবং বিপক্ষে মুখ খুলতে হবে। আমরা যারা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক তাদের মুখ খুলতে হবে সবার আগে।

বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা পদ্ধতিতে আমি সময় কাটিয়েছি খুব কম, এখনো আমার দুই বছর পুরো হয়নি কিন্তু নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকদের সংখ্যা অপ্রতুল বলে এই সময়ে আমাকে যথেষ্ট দায়িত্ব পালন করতে হয়েছে। আমি ছাত্রদের পড়িয়েছি, ল্যাবরেটরিতে ক্লাস নিয়েছি, বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্ব পালন করেছি, ফ্যাকাল্টির ডিন হিসেবে কাজ করেছি, একাডেমিক কাউন্সিল এবং সিন্ডিকেটের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছি, শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগের সিলেকশন কমিটিতে থেকেছি, ক্রীড়া কমিটির সভাপতি হিসেবে আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয়ের খেলা পরিচালনা করেছি, ভর্তি কমিটির সভাপতি হিসেবে নতুন ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তির দায়িত্ব গ্রহণ করেছি, তদন্ত কমিটির সদস্য হিসেবে সন্ত্রাসী ঘটনার তদন্ত করেছি এবং ছাত্রছাত্রীদের সাংস্কৃতিক সংগঠনের উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করেছি। স্বল্প সময়ের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত হলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের খুঁটিনাটি কাজ এবং সমস্যার সামগ্রিক ধারণা আমার রয়েছে, আমার বিশ্বাস রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ যে বিষয়টির অবতারণা করেছেন সে বিষয়েও আমার একটু বক্তব্য রাখার অধিকার রয়েছে।

আঠারো বছর দেশের বাইরে থাকার পর বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিয়ে আমি ত্রাহি মধুসূদন বলে ডাক ছাড়বো বলে যে সাংবাদিক ভদ্রলোক ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন এবং আমাকে 'নাইভ' বিশেষণে ভূষিত করেছিলেন তার সঙ্গে আমার আর কখনো দেখা হয়নি। দেখা হলে আমি তাকে জানাতাম যে, তার ধারণাটি এখনো সত্যি প্রমাণিত হয়নি। একথা সত্যি, টেলিফোনে আমি দু'চারবার হুমকি শুনেছি এবং মৌলবাদী পত্রিকায় আমাকে কাফের বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। তবে সেটি নিয়ে আমি বিশেষ মাথা ঘামাইনি (সম্ভবত আমি নাইভ সেই কারণেই।) তবে আমার খুব সৌভাগ্য যে, কাজ করার জন্য আমি সিলেটের শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো নতুন একটি বিশ্ববিদ্যালয় বেছে নিয়েছিলাম। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল চালিকাশক্তি হচ্ছেন কমবয়সী তরুণ শিক্ষকরা। বড়ো বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিজ্ঞ শিক্ষক নয় বলে তারা কোনো ঝুঁকি নেন না, তাদের সমস্ত শক্তি তারা ছাত্রছাত্রীদের জন্য ব্যয় করেন। একটি ক্লাস মিস হয়ে গেলে তারা পরে সেটি পুষিয়ে দেন। হরতাল-ধর্মঘটের দিনে পরীক্ষা নিতে না পারলে রাতে পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে এখনো সেশনজট নেই, বড়ো ধরনের সন্ত্রাস নেই। চাঁদাবাজদের যন্ত্রণায় এই বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো কাজ বন্ধ নেই। এটিই সম্ভবত একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়

যেখানে সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণভাবে সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। একজন ছাত্র এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করে এই বিশ্ববিদ্যালয়েই শিক্ষক হিসেবে যোগ দিয়ে আবিষ্কার করেছে যে, সে দেশের সর্বকনিষ্ঠ শিক্ষক।

বিশ্ববিদ্যালয়টি এখন গড়ে উঠেছে, কোনো কিছু গড়ে উঠতে দেখার মতো আনন্দ আর কিছুতে নেই। যারা এই বিশ্ববিদ্যালয়টি গড়ে তুলছিলেন তারা আমাকে সাদরে তাদের মাঝে গ্রহণ করেছেন। তাদের সঙ্গে কাজ করার সুযোগ পেয়ে আমি এক ধরনের গর্ব অনুভব করি—নাইভ মানুষের গর্ব কিন্তু গর্ব তাতে সন্দেহ নেই।

বিশ্ববিদ্যালয়টি ধীরে ধীরে আমার চোখের সামনে গড়ে উঠেছে। কিন্তু আমি জানি এই সমস্ত শিক্ষা পদ্ধতি আসলে একটা তাসের ঘরের মতো দাঁড়িয়ে আছে। এটি যেকোনো মুহূর্তে ধসে যেতে পারে এবং তার একটিই মাত্র কারণ সেটি হচ্ছে ছাত্র রাজনীতি—আমাদের মহামান্য রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ যে ছাত্র রাজনীতির কথা উল্লেখ করেছেন সেই ছাত্র রাজনীতি।

২.

আমি এই বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেওয়ার কিছুদিনের মাঝেই এখানে একটি সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটে। একটি ছাত্র অন্য একটি ছাত্রকে প্রকাশ্যে ছোরা দিয়ে আঘাত করে বসে। যে আঘাত করেছে এবং যাকে আঘাত করেছে দুজনই ছাত্রদের রাজনৈতিক সংগঠনের সক্রিয় সদস্য, কাজেই সংগঠনগুলো নিজেদের স্বার্থ রক্ষা করার জন্য সচেষ্ট হয়ে উঠে। সঙ্গে সঙ্গেই দেশের জাতীয় রাজনৈতিক দলগুলোও তাদের অঙ্গ সংগঠনকে সহায়তা দেওয়ার কাজে লেগে পড়ে এবং দেখতে দেখতে পুরো ব্যাপারটি একটি কুৎসিত রূপ নিয়ে নেয়—বিশ্ববিদ্যালয়কে বন্ধ করে দেওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় থাকে না। এরকম অবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তারা একটা ব্যতিক্রমধর্মী ব্যাপারের আয়োজন করলেন। সিলেট শহরের সমস্ত রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে ডেকে এনে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-কর্মকর্তাদের মুখোমুখি মতবিনিময়ের একটা পরিবেশ সৃষ্টি করলেন। সেই মতবিনিময় অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলোকে অনুরোধ করা হয়েছিল তারা যেন বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব ব্যাপারে ছাত্রদের ব্যবহার না করেন, তাদের ব্যবহার করে কোনো ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করেন। আমি মোটামুটিভাবে নিশ্চিত ছিলাম রাজনৈতিক দলগুলো অন্ততপক্ষে মৌখিকভাবে

হলেও সৌজন্যতার খাতিরেই এই প্রতিশ্রুতিটি দেবে। কিন্তু আমি হতচকিত হয়ে আবিষ্কার করলাম কোন কোন দল সেই মৌখিক প্রতিশ্রুতিটি পর্যন্ত দিতে রাজি হলো না। শুধু তাই নয়, তারা পরিষ্কারভাবে আমাদেরকে জানিয়ে দিলো বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো সিদ্ধান্ত যদি তাদের পছন্দ হয় শুধুমাত্র তাহলেই তারা সেটাকে সমর্থন দেবে, না হয় দেবে না।

আমি তখন প্রথমবার আবিষ্কার করেছিলাম, বিশ্ববিদ্যালয়টি আসলে কোনো শক্ত ভিত্তির উপরে দাঁড়িয়ে নেই। অনেক যত্ন করে শিক্ষা পদ্ধতির যে সুরম্য অট্টালিকা তৈরি হয়েছে যেকোনো রাজনৈতিক দল ছাত্রদের নিয়ে তৈরি তাদের অঙ্গ সংগঠনগুলোকে ব্যবহার করে এক মুহূর্তে সেই অট্টালিকাকে তাসের ঘরের মতো ফেলে দিতে পারে। এখানে মুখের কথায় ধর্মঘট ডাকা যায়, ইচ্ছে করলে ক্লাস বন্ধ করে দেওয়া যায়, গেটে তালা লাগিয়ে সবকিছু অচল করে দেওয়া যায়। ছাত্র সংগঠনগুলো অস্ত্র নিয়ে সজ্জিত, সাধারণ ছাত্র দর্শক, পুলিশ পুরো ব্যাপারে উদাসীন এবং রাজনৈতিক দলগুলোর হাতে পুরো কলকাঠি। আমি ধীরে ধীরে আরো কিছু জিনিস আবিষ্কার করেছি। কিছু কিছু কথা অবিশ্বাস্য শুনালেও সত্যি। আমাদের দেশের রাজনৈতিক নেতারা দেশের ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনার গুরুত্বটি এখন পর্যন্ত ধরতে পারেননি। তাদের আচার-আচরণ দেখে মনে হয়, রাজনৈতিক দলগুলোর ক্ষমতায় আসার এবং ক্ষমতায় থাকার জন্য ছাত্রদের যেটুকু ব্যবহার করা প্রয়োজন তারা শুধু সেটুকুতেই বিশ্বাস করেন। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ যদি সত্যি ছাত্রদের পড়াশোনায় বিশ্বাস করতেন তাহলে হরতাল-ধর্মঘটের সময় যেভাবে এম্বুলেন্স, হাসপাতাল, চিকিৎসা কেন্দ্রকে তাদের আওতার বাইরে রাখা হয় সেভাবে স্কুল-কলেজ-ইউনিভার্সিটিকে হরতাল-ধর্মঘটের আওতার বাইরে রাখতেন। রাজনৈতিক কার্যক্রমে দেশের পড়াশোনার যে ভয়ঙ্কর ক্ষতি হয়, সেই ক্ষতিটুকু দেশের নীতিনির্ধারকদের এবং যারা হরতাল-ধর্মঘট ডেকে দেশকে অচল করার ক্ষমতা রাখেন তাদের চোখে পড়ে না—এটি একটি অবিশ্বাস্য ব্যাপার। তারা নিশ্চয়ই একটি কম্পিউটারের প্রোগ্রাম নন, তারা নিশ্চয়ই মানুষ, তাদের সন্তানসন্ততি নিশ্চয়ই আছে, তাহলে কিভাবে তারা নিজের সন্তানসন্ততিকেও এর মাঝে ঠেলে দিচ্ছেন? এর একটিমাত্র উত্তর, যারা এই দেশকে চালান এবং যারা দেশকে যখন খুশি অচল করে দেওয়ার ক্ষমতা রাখেন তারা এই দেশের সাধারণ মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত দরিদ্র জনগোষ্ঠী থেকে বিচ্ছিন্ন—হয় তাদের সন্তানদের পড়াশোনার প্রয়োজন নেই, না হয় তাদের সন্তানরা দেশের বাইরে নিরাপদ আশ্রয়ে পড়াশোনা করে

উচ্চ শিক্ষিত হয়ে দেশে ফিরে এসে দেশের হাল ধরার প্রস্তুতি নিচ্ছে। দেশের ভিতরের শিক্ষা ব্যবস্থা ধ্বংস হলেও তারা প্রত্যক্ষভাবে সেটা অনুভব করেন না, সেটা দিয়ে জোরালো একটা রাজনৈতিক বক্তব্য হয় তার বেশি কিছু নয়।

৩.

রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ-এর বক্তব্য প্রকাশিত হওয়ার পর থেকে ছাত্র রাজনীতির প্রয়োজনীয়তা নিয়ে অনেক ভালো ভালো কথা শোনা যাচ্ছে। তার মাঝে কিছু সত্যতা রয়েছে কিন্তু এই ছাত্র রাজনীতির কারণে দেশের ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনায়, তাদের মূল্যবোধে, নৈতিকতায়, চিন্তাধারায়, সহিষ্ণুতায় যে ভয়াবহ সর্বনাশ ঘটেছে শুধুমাত্র সেটা বিবেচনা করেই যেকোনো মূল্যে ছাত্র রাজনীতিকে বন্ধ করতে হবে। রাজনীতি করার সবার সমান অধিকার সেই অধিকার কেউ কারো কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে পারবে না। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র হিসেবে প্রবেশ করার পর ক্যাম্পাসে সে কী করতে পারবে এবং কী করতে পারবে না সেই বিষয়টি নির্ধারণ করার অধিকার বিশ্ববিদ্যালয়ের রয়েছে।

বাংলাদেশ টেলিভিশনের কারণে আমরা জাতীয় সংসদে বিভিন্ন সাংসদদের বক্তব্য শুনতে পাই। এটি অত্যুক্তি নয়, ঝানু রাজনীতিবিদ —যারা দীর্ঘকাল রাজনীতি করে নিজেদের অঞ্চলে সাধারণ মানুষদের ভোটে নির্বাচিত হয়ে সংসদে এসেছেন তাদের মাঝেও একজন-দুজনকে পাওয়া যায় যাদের বক্তব্য, আচার-আচরণ, অঙ্গভঙ্গি অনেক সময় আমাদের কাছে অর্থহীন, হাস্যকর এবং ছেলেমানুষি বলে মনে হয়। যদি জাতীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের আচার-আচরণে আমরা প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতার চিহ্ন না দেখি তা হলে কীভাবে আমরা কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের আঠারো-উনিশ বছরের ছেলের মাঝে সেই রাজনৈতিক প্রজ্ঞা আশা করবো? তাদের বয়স কম, তারা আবেগপ্রবণ, কোন আদর্শের চেতনায় সাধারণত তারা কোনো দলভুক্ত হয় না, ঘটনাক্রমে কিংবা প্রয়োজনে হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের মিছিলে একটি ছেলে সবসময় আমাকে দেখে ফাইল দিয়ে তার মুখ ঢেকে রাখে, একটি ছাত্র সংগঠনে যোগ দিয়ে তার ভিতর লজ্জার জন্ম হয়েছে তাই আমার সামনে নিজের পরিচয় প্রকাশ করতে চায় না। তাহলে কেন সে দলটিতে যোগ দিয়েছে? এটি কী স্বতঃস্ফূর্ততা? একটি দলের সদস্য হয়ে যাওয়ার পর তারা সেই দলের নির্দেশ মানার জন্য অঙ্গীকারভুক্ত থাকে।

তাদেরকে দলের ছকবাঁধা নিয়মের বাইরে যাওয়ার উৎসাহ দেওয়া হয় না। তারা যে কাজটি সবচেয়ে ভালোভাবে করতে পারে তাদেরকে সেই কাজের জন্য প্রস্তুত রাখা হয়—সেটি হচ্ছে আন্দোলন।

আমার বিশ্বাস এ দেশের মানুষের আন্দোলনের ওপর বিশ্বাসও কমে আসছে। বিশাল আন্দোলন করে, সরকার পরিবর্তন করে ফেলার ঘটনা আমরা অনেকবার দেখেছি কিন্তু তারপর সুসংহতভাবে দেশকে চালানোর ঘটনা এখনো দেখিনি। সরকার পরিবর্তনের জন্য আসলে আন্দোলনেরও প্রয়োজন নেই, প্রয়োজন একটু ধৈর্যের। পাঁচ বছর পর তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচনে একটি সরকারকে পাল্টে ফেলা এখন নিশ্চয়ই অসম্ভব কিছু নয়। কিন্তু আমরা রাজনীতিবিদ নই, আমরা তাদের মতো করে চিন্তা করতে পারি না। রাজনৈতিক দলকে সবসময় রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড করতে হয়, কর্মসূচি দিতে হয় সংগঠনকে সচল রাখার জন্য সভা-সমিতি-মিছিল করে যেতে হয়। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, এর মাঝে ছাত্রছাত্রীদের অন্তর্ভুক্ত না করেও চমৎকার কাজ চলে যেতে পারে। এর সবচেয়ে বড়ো উদাহরণ সম্ভবত বিগত অসহযোগ আন্দোলন, ছাত্রদের বড়ো ধরনের সহযোগিতা ছাড়াই এই বিশাল আন্দোলনটি সফল হয়েছিল। শুধু তাই নয়, গত নির্বাচনেও ছাত্রদের ভূমিকা ছিল খুব কম। যদি রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে ছাত্রদের ভূমিকার প্রয়োজন সত্যিই কমে এসে থাকে তাহলে কি এটি রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের কথাটি মন দিয়ে শোনার একটি খাঁটি সময় নয়?

৪.

দেশে অসংখ্য স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে, তার সব কটির খবর আমি জানি না। খবরের কাগজে যা ছাপা হয় তা থেকে ধারণা করতে হলে ধরে নিতে হবে খবর বেশি ভালো নয়। আমি শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক তাই এর খবর আমি নিখুঁতভাবে জানি। যদি এই বিশ্ববিদ্যালয়টিকে একটি পরীক্ষাগার হিসেবে ধরে নেই তাহলে এই পরীক্ষাগারে পাওয়া তথ্যগুলো এরকম :

(ক) সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা ক্যাম্পাসে ছাত্র রাজনীতির বিপক্ষে। যদি কখনো বিশ্ববিদ্যালয়ে রেফারেন্ডাম দিয়ে ছাত্রছাত্রীদের জিজ্ঞেস করা যায়, তারা ক্যাম্পাসে ছাত্র রাজনীতি দেখতে চায় কিনা—ছাত্রছাত্রীরা নিশ্চিতভাবে ছাত্র রাজনীতির বিরুদ্ধে ভোট দেবে। তবে বিচ্ছিন্নভাবে একটি ক্যাম্পাসে ছাত্র

রাজনীতি বন্ধ করে কোনো লাভ নেই, তাহলে প্রকৃত অর্থে রাজনীতি বন্ধ হয় না। যদি ক্যাম্পাসে ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করতে হয়, তাহলে এক সঙ্গে সব জায়গায় বন্ধ করতে হবে।

(খ) বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো একটি ঘটনা ঘটে গেলে প্রত্যেকটি অঙ্গ সংগঠন সেটাকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করার চেষ্টা করে।

(গ) একবার একটি ছাত্র কোনো রাজনৈতিক অঙ্গ সংগঠনে ঢুকে গেলে তাকে কোনো-না-কোনো অঙ্গ সংগঠনে থাকতে হয়। এক সংগঠন থেকে বহিষ্কৃত হয়ে ছাত্ররা রুটিন মাফিক অন্য সংগঠনে নেতা হিসেবে যোগ দিয়ে থাকে।

(ঘ) কোনো কোনো ছাত্র সংগঠনকে সাধারণ ছাত্ররা সত্যিকার অর্থে ভয় পায়। আমি তদন্ত কমিটির সদস্য হিসেবে আবিষ্কার করেছি— ছাত্ররা গোপনে প্রকৃত অপরাধীর নাম আমার কাছে প্রকাশ করে গেলেও কমিটির সামনে কিছুতেই মুখ খুলবে না।

(ঙ) বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো একটি ঝামেলায় জড়িয়ে গেলে, ছাত্ররা নিজেদের রক্ষা করার জন্য অনেক সময় তড়িঘড়ি করে কোনো একটি সংগঠনে যোগ দিয়ে দেয়। (কিছুদিন আগে একজন ছাত্রনেতা আমার কাছে আস্ফালন করে বলে গেলো যে, তাদের দলে সদ্য যোগ দেওয়া একজনের বিরুদ্ধে কোনো ধরনের শাস্তি দেওয়া হলে তারা সেটা মেনে নেবে না।)

(চ) ছাত্ররা তাদের নিজেদের অঙ্গ সংগঠনের সদস্যদের রক্ষা করার জন্য সাধ্যমতো চেষ্টা করে থাকে। সেই চেষ্টা প্রায় সময় নীতি বহির্ভূত হয়ে যায়— মিথ্যা সাক্ষী দেওয়া অসংখ্য লিখিত প্রতিবেদন আমার আলমারিতে সযত্নে রক্ষা করা আছে। নীতি এবং আদর্শ বলে যে জিনিসটি তরুণ ছাত্রদের মাঝে থাকার কথা ছিল, ছাত্র সংগঠনগুলোতে সেটির চর্চা আছে বলে মনে হয় না।

৫.

কিছুদিন আগে সন্ধ্যাবেলা হঠাৎ করে আমার কাছে টেলিফোন এসেছে, টেলিফোনে একজন ছাত্র আমাকে জানালো আমার একটা ছাত্র গুলি খেয়েছে, সে হাসপাতালের ইমার্জেন্সিতে আছে। খবর পেয়ে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আমি হাসপাতালে ছুটে গেলাম। ছেলেটিকে তখন ইমার্জেন্সি থেকে বের করে একটা

টুলিতে শুইয়ে রাখা হয়েছে। তার অনাবৃত দেহ রক্তে সিক্ত, সে ফ্যাকাসে মুখে অসহায়ভাবে শুয়ে আছে। আমরা প্রায় প্রতিদিন খবরের কাগজে এইধরনের খবর পড়ি কিন্তু ব্যাপারটি যে সত্যিকার অর্থে কী সেটি আমি এই প্রথমবার অনুভব করলাম। আমার পরিচিত প্রিয় একটি ছাত্র মৃত্যুর কাছাকাছি দাঁড়িয়ে আছে, সম্পূর্ণ অকারণে, ছাত্র রাজনীতি নামের ব্যাপারটির দুর্বোধ্য নিয়মকানুনে তাকে হত্যা করার জন্য গুলি করা হয়েছে। যে গুলি করেছে সেও আমাদের ছাত্র—তার পরিচিত, খেলার সাথী, অবসরের সঙ্গী। রাজনীতির এটি কোন অংশ যার কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ে উনিশ কুড়ি বছরের ছেলের হাতে অস্ত্র উদ্যত হয়ে উঠে? হাসপাতালে ফ্যাকাসে মুখে ছেলেটির হাত স্পর্শ করে আমি হঠাৎ নিজের ভিতরে এক ধরনের বিজাতীয় অসহায় ক্রোধ অনুভব করতে থাকি। আমি নিশ্চিত আমার আগে অসংখ্য বাবা-মা, ভাই-বোন, শিক্ষক, আত্মীয়স্বজন এই অসহায় ক্রোধ অনুভব করেছে। এই ছাত্ররা আমাদের। আমরা তাদের পড়াবো, শিখাবো, মানুষ করে গড়ে তুলবো। রাজনৈতিক দলগুলোকে তাদের নিজেদের প্রয়োজনে ব্যবহার করতে দেবো না। একজনের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়ে আরেকজনকে গুলি করতে দেবো না। আমার ক্ষমতা থাকলে সেই মুহূর্তে আমি চিৎকার করে সারাদেশের মানুষকে শুনিয়ে বলতাম, "যথেষ্ট হয়েছে। আর না। আমার ছেলেমেয়েদের এখন আমার হাতে ফিরিয়ে দাও।"

আমার ক্ষমতা ছিল না তাই বলতে পারিনি। কিন্তু বলতে হবে। আজ হোক, কাল হোক আমাদের বলতে হবে। রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ বলেছেন, আমাদেরকেও বলতে হবে।

৬.

মাসখানেক আগে ভোরবেলা আমার অফিসের দরজায় একটা ছেলে এসে বিনীতভাবে প্রবেশ করার অনুমতি চাইল। অনুমতি দেওয়ার পর খানিকক্ষণ সে কুণ্ঠিতভাবে দাঁড়িয়ে থেকে বললো, "স্যার, আমার খুব মন খারাপ।" আমি জিজ্ঞেস করলাম, "কী হয়েছে?" সে বললো, "স্যার, বাড়ি থেকে অনেকদিন হলো এসেছি, শুধু সবার কথা মনে পড়ছে, আর মন খারাপ লাগছে। কী করবো বুঝতে পারছি না।" কথা বলতে বলতে ছেলেটির চোখ ছলছল করতে থাকে এবং আমি হঠাৎ করে তার ভিতরে নিজেকে আবিষ্কার করলাম। এই বয়সে আমিও প্রথমবার হোস্টেলে গিয়ে ছলছলে চোখে খুব মন খারাপ করে বসে থাকতাম।

আমি আমার হাতের কাজ সরিয়ে রেখে নরম গলায় ছেলেটির সঙ্গে কথা বললাম, তার বাড়ির কথা জিজ্ঞেস করলাম, মা-ভাই-বোনের কথা জানতে চাইলাম। বাড়িতে প্রতি সপ্তাহে চিঠি লেখার উপদেশ দিলাম। দেখতে দেখতে ছুটি চলে আসবে বলে সান্ত্বনা দিলাম। কথা বলে ছেলেটির মন ভালো হলো, সে আমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গেলো।

আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশির ভাগ ছাত্র, এই মন খারাপ হয়ে যাওয়া ছাত্রের মতো। তারা মধ্যবিত্ত, নিম্নমধ্যবিত্ত এমনকি দরিদ্র পরিবার থেকে প্রথমবার বাড়ি ছেড়ে এসেছে। তাদের কেউ কেউ টিউশনি করে। বাড়ি ছেড়ে চলে এসে তাদের মায়ের কাছে যাওয়ার জন্য মন কাঁদে। তাদের ভাই-বোনের কথা মনে হয়। তারা সবকিছু মন থেকে সরিয়ে পড়াশোনা করে, পরীক্ষা দেয়। তারা পাস করে ভালো একটা চাকরি পাওয়ার আশা করে, কেউ কেউ উচ্চ শিক্ষার স্বপ্ন দেখে। তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের কালচারে নিজেদের সম্পৃক্ত করে শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতি নিজেদের সিক্ত করে।

কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র বললে আজকাল আর তাদের কথা কারো চোখে ভেসে আসে না। আমাদের চোখের সামনে ভেসে আসে রাজনৈতিক অঙ্গ সংগঠনের পোড়খাওয়া ক্যাডারের ছবি, কাটা রাইফেল হাতে যুক্তি-তর্ক বোধশক্তিহীন স্বার্থপর অসহিষ্ণু অবিবেচক কিছু তরুণের ছবি। তারা সংখ্যায় নগণ্য, হাতে গোনা যায় কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের অসংখ্য ছাত্রছাত্রীকে এই হাতে গোনা কয়েকজনের কাজকর্মের বোঝা নিজেদের কাঁধে করে বহন করতে হচ্ছে। ঢাকায় এক সময় গাড়ি নিয়ে কেউ বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় যেতো না। গাড়ি ভাঙচুর হবে ও ছিনতাই-হাইজ্যাক হওয়ার ভয়ে। মাসখানেক আগে গ্রামবাসীরা এসে শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়কে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে গেছে, ব্যাপারটি শুরু হয়েছে টেম্পোচালকের সঙ্গে এক ছাত্রের বচসা থেকে, ব্যাপারটি গড়িয়েছে গাড়ি ভাঙচুর দিয়ে— শেষ পর্যন্ত পুলিশের নাকের ডগা দিয়ে শ' খানেক মানুষ লাঠিসোঁটা নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকে গিয়ে সেটিকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে গেছে। ক্ষিপ্ত গ্রামবাসীরা বিশ্ববিদ্যালয়, তার ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কে যেসব মন্তব্য করে গেছে, আমি নিজের কানে সেগুলো শুনেছি, শুনে শিউরে উঠেছি। দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ সম্পর্কে সাধারণ গ্রামবাসীর ভিতরে এতো তীব্র ঘৃণা কেমন করে জন্ম নিলো? আমরা কী এর জন্য দায়ী নই? কোথায়

আমরা ভুল করেছি? আমরা কি চোখ বন্ধ করে থাকবো? নাকি সেই ভুলটি স্বীকার করে নেবো?

৭.

শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বশেষ ঘটনাটি ঘটে যাওয়ার পর, সিলেট শহরের সব রাজনীতিবিদ আবার বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-কর্মকর্তার সঙ্গে একত্র হয়েছিলেন। দীর্ঘ আলোচনার পর তারা যে কথাটি বলেছিলেন, সেটি শুনে আমি প্রথমবার আশান্বিত হয়েছি। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দরা বলেছেন, তারা রাজনীতিবিদ, তাই রাজনীতি করবেন কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়টি কখনোই সেই রাজনীতির অংশ হবে না। যে প্রতিশ্রুতিটি বছর দেড়েক আগে তাদের কাছে চাওয়া হয়েছিল, কিন্তু পাওয়া যায়নি এটি এবারে না চাইতেও তারা আমাদের উপহার দিয়েছেন। এটি একটি কঠিন অঙ্গীকার, এই অঙ্গীকার রক্ষা করা সম্ভবত আরো কঠিন। আমি বিশ্বাস করতে চাই, তারা তাদের অঙ্গীকারটি রক্ষা করবেন।

এই অঙ্গীকারটি সত্যিকার অর্থে রক্ষা করতে চাইলে তাদেরকে একটি ত্যাগ স্বীকার করতে হবে, সেটি হচ্ছে, বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের অঙ্গ সংগঠনটির ব্যবহার। সত্যি যদি তারা তাদের কথা রাখেন রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের উক্তিটি সত্য প্রমাণ করা কঠিন হবে বলে মনে হয় না।

আমি আশাবাদী মানুষ, আমি নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করি, আমরা আমাদের ছেলেমেয়েদের ফিরে পাবো। সেই প্রক্রিয়াটি শুরু হয়ে গেছে—কেউ স্বীকার করুক আর নাই করুক।

—ভোরের কাগজ, ২৬ অক্টোবর ১৯৯৬।

পঁচিশ বছর পর

সময় একটি বিচিত্র ব্যাপার, এটি কখন আমাদের সঙ্গে কীভাবে ব্যবহার করবে আগে থেকে বোঝা খুব মুশকিল। গত রাতে ঘটে যাওয়া একটি ঘটনা অনেক সময় কষ্ট করে মনে করতে হয়, আবার কয়েক যুগ আগে ঘটে যাওয়া একটি ঘটনা এখনো এতো স্পষ্ট মনে রয়েছে যে হঠাৎ করে মনে পড়ে গেলে সেটিকে রীতিমতো জোর করে মন থেকে সরিয়ে নিতে হয়। সময়ের ব্যবধান বিশাল হয়ে ওঠে কোন ঘটনাটিকে স্মৃতি থেকে সরিয়ে দেবে আবার কোন ঘটনাটি মস্তিষ্কে এমনভাবে গেঁথে দেবে যে, সময় তার সমস্ত শক্তি দিয়েও সেখানে এতোটুকু বিচ্যুতি ঘটাতে পারবে না সেটি আগে থেকে বোঝা খুব মুশকিল, তার ওপর কারো নিয়ন্ত্রণও নেই। যদি নিয়ন্ত্রণ থাকতো তাহলে মানুষ যেমন করে বইয়ের তাকে প্রিয় বইকে সাজিয়ে রাখে আমি সেভাবে সেই স্মৃতিগুলোকে সাজিয়ে রাখতাম। অলস মধ্যাহ্নে আধশোয়া হয়ে বইয়ের তাকে হাত দিলেই যেরকম একটা প্রিয় বই উঠে আসে ঠিক সেরকম কিছু একটা ভাবার জন্য মস্তিষ্কের শরণাপন্ন হলেই মাথার মাঝে কোনো তীব্র আনন্দ কোনো গভীর ভালোবাসার স্মৃতি উঠে আসতো। কিন্তু মস্তিষ্কের মাঝে যে স্মৃতির তাক রয়েছে সেখানে আমি হাত দিতে পারি না, আমার ভিতরকার অন্য কোনো একজন 'আমি' সেখানে স্মৃতিগুলো সাজিয়ে রাখে। সেখানে তুচ্ছ অর্থহীন ঘটনার পাশে সাজানো আছে গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাস, হাস্যকর ছেলেমানুষি স্মৃতির পাশে ব্যক্তিগত ক্রোধ, ভয়ঙ্কর, বীভৎসতা কিংবা তীব্র আনন্দের স্মৃতি। এসব স্মৃতির মাঝে কোনো অন্তর্নিহিত সামঞ্জস্য নেই, শুধু এটুকু জানি আমার জীবনের সবচেয়ে তীব্র যে সুখের অনুভূতি, সবচেয়ে তীব্র যে দুঃখ কিংবা উল্লাস, সবচেয়ে ভয়ঙ্কর যে ঘৃণা সবকিছু জড়িয়ে আছে একাত্তরের সঙ্গে। তীব্র অনুভূতির কোনো স্মৃতিকে স্পর্শ করলেই সেখান থেকে একাত্তরের কোনো স্মৃতি উঠে আসে—আমি চাইলেও আসে আমি না চাইলেও আসে। আমার দুঃখের সংজ্ঞা দিতে হলে একাত্তরের দিকে চাইতে হয়, হতাশা-ঘৃণা এবং ক্রোধের সংজ্ঞাও

রয়েছে একাত্তরে, আমার উল্লাস এবং আমার স্বপ্নও লুকিয়ে আছে একাত্তরে। আমার মতো অন্য যারা একাত্তরের মাঝ দিয়ে কৈশোর থেকে পূর্ণবয়স্ক মানুষে রূপান্তরিত হয়েছে তাদের সবার কথা জানি না, কিন্তু আমার নিজের কথাটুকু জানি, আমার সমস্ত তীব্র অনুভূতির অভিধান হচ্ছে উনিশ শ একাত্তর।

২.

গত বছর বিজয় দিবসের মাঝরাতে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ মিনারে ছাত্ররা হঠাৎ করে আমাকে উঁচু বেদিটুকুতে তুলে দিয়ে বললো, "স্যার, কিছু একটা বলুন।" আমি ভালো বক্তা নই, গুছিয়ে বলতে পারি না। যতোদূর মনে পড়ে বিড়বিড় করে বলেছিলাম, "তোমাদের দেখে আমার এক ধরনের ঈর্ষা হয়। উনিশ শ একাত্তরে তোমাদের জন্ম হয়নি, কাজেই ঘৃণা নামক জিনিসটি কী তোমরা জান না। শুধু তাই নয়, তোমরা কোনোদিন সেটা জানতেও পারবে না। ঘৃণা কথাটি কী সেটা জানে শুধু তারাই যারা উনিশ শ একাত্তর সালে পাকিস্তান মিলিটারি এবং তাদের দালালদের সঙ্গে পাশাপাশি আটকা পড়েছিল।"

পরদিন আমার কাছে একটা ছেলে ফিরে এসেছিল, তার চুল উস্কখুস্ক এবং চোখ রক্তাভ। সে বললো, "স্যার, কাল রাতে আপনার কথা শুনে আমি সারা রাত ঘুমাতে পারিনি। কেন আপনি এ রকম একটা কথা বলেছেন?" আমি তরুণ ছাত্রটির দিকে তাকিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিলাম, তাকে বলেছিলাম, "তুমি সেটা শুনতে চেয়ো না। আমাদের অনেক গৌরবের কথা আছে, সাহসের কথা আছে, বীরত্ব আর ভালোবাসার কথা আছে। তুমি তার কথা শোনো। ঘৃণা আর প্রতিহিংসাটুকু আমরা বুকে ধরে রাখবো—আমাদের আর কিছু করার নেই।"

পবিত্র কোরআন শরীফে বেহেশতের অনেক বর্ণনা দেওয়া আছে, যে বর্ণনাটি সবচেয়ে সুন্দর সেখানে লেখা আছে একজন যখন বেহেশতে যাবে তখন তার বুকের ভিতর থেকে সমস্ত প্রতিহিংসা সরিয়ে নেওয়া হবে। কথাটি আমার খুব পছন্দ হয়েছিল এই কারণে যে এটিকে অন্যভাবেও ব্যাখ্যা করা যায়। কেউ যদি এই পৃথিবীতে বসেই তার বুকের ভিতর থেকে সমস্ত প্রতিহিংসা সরিয়ে নেয় তাহলে তার ভিতরে নিশ্চয়ই স্বর্গীয় অনুভূতির জন্ম হবে। আমি সেই বাক্যটি পড়ার পর থেকে মাঝে মাঝে সজ্ঞানে আমার বুক থেকে ঘৃণা, বিদ্বেষ আর প্রতিহিংসা দূর করার চেষ্টা করে আসছি। বিশেষ বিশেষ দিনে আমি ঘুম

থেকে উঠে বিড়বিড় করে নিজেকে বলি, "আজ থেকে আমি সবাইকে ক্ষমা করে দেবো। যে পাকিস্তানি মেজর আমার বাবাকে বিষণ্ণ নদী তীরে গুলি করে হত্যা করেছিল আমি তাকে ক্ষমা করে দেবো, যে সৈন্যগুলো আমার কৈশোরের খেলার সাথীকে মুক্তিযোদ্ধা হওয়ার অপরাধে বেয়োনেট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে হত্যা করেছে আমি তাদেরকেও ক্ষমা করে দেবো, বাংলাদেশে গণহত্যার নায়ক টিক্কা খানকে ক্ষমা করে দেবো, গোলাম আযম যে টিক্কা খানের সঙ্গে বসে বসে হত্যাকাণ্ডের নীলনকশা তৈরি করেছে তাকেও ক্ষমা করে দেবো, ঢাকা কলেজ হোস্টেলে আমার পাশের রুমের ইসলামী ছাত্রসংঘের ছেলেটি যে আমার স্যারদের রায়ের বাজার বিলে নিয়ে জবাই করেছে তাকেও ক্ষমা করে দেবো, ইয়াহিয়া খানকে ক্ষমা করে দেবো, ভুট্টোকে ক্ষমা করে দেবো, দেশের সব রাজাকার-আলবদরকে ক্ষমা করে দেবো।"

কিন্তু আমি আসলে তাদের ক্ষমা করতে পারি না। আমার বুকের ভিতরে পাথরের মতো কী একটা চেপে বসে থাকে ঘৃণা-বিদ্বেষ আর প্রতিহিংসা আমার রক্তের মাঝে স্রোতের মতো বইতে থাকে। মাথার মাঝে একাত্তরের ছোট ছোট ছবি ভেসে আসে, ছোট ছোট ঘটনা, ছোট ছোট দীর্ঘশ্বাস—

একদিন অবরুদ্ধ বাংলাদেশের এক গ্রামের পথ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছি হঠাৎ সেই পথে একটা চাপা উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়লো। উনিশ শ একাত্তর সালে তার অর্থ একটিই, এই পথ দিয়ে পাকিস্তানি মিলিটারি আসছে। আমি তখন যে গ্রামে আশ্রয় নিয়েছি তার খুব কাছে মিলিটারি ক্যাম্প। সেখানে পাকিস্তানি সৈন্যদের স্থায়ী ঘাঁটি, কিছুদিন একটি দল থাকে তারপর তারা চলে গিয়ে অন্য আরেকটি দল আসে। এবারে যে দলটি এসেছে সেটি সম্ভবত খাঁটি সেনাবাহিনী নয়, মিলিশিয়া ধরনের। যখন ক্যাম্প থেকে বের হয় সব সময় সামরিক পোশাক পরে বের হয় না। কেউ কেউ লুঙ্গি পরা শিখেছে, পায়ে বুট জুতোর সঙ্গে খাটো করে লুঙ্গি এবং ওপরে ঢোলা শার্ট পরে বের হয়ে আসে। সবার পিঠে থাকে স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র, বুকের মাঝে ঝোলানো থাকে গুলির বেল্ট। চকচকে পোশাকের পাকিস্তান সেনাবাহিনী যেরকম ভয়ঙ্কর দেখায় এদেরকে তাদের থেকেও বেশি ভয়ঙ্কর দেখায়—অবিন্যস্ত পোশাকের সঙ্গে অস্ত্রগুলো কেমন জানি দস্যু এবং লুটেরার ভাব নিয়ে আসে।

নির্জন গ্রামের পথ দিয়ে যখন কোথাও ছুটে যাবো চিন্তা করছি ঠিক তখন দেখতে পেলাম মিলিশিয়ার ছোট একটি দল রাস্তার পাশে একটা বাড়িতে ঢুকে

পড়লো। আমার সেই মুহূর্তে সেখান থেকে সরে পড়া উচিত ছিল কিন্তু কিছু একটা আমার পা'কে মাটির সঙ্গে বেঁধে ফেললো, আমি সেখানে স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে রইলাম।

বাড়ির ভিতর থেকে হঠাৎ একটা মেয়ের গলার কান্নার শব্দ শুনতে পেলাম। চিৎকার করে কান্না নয়, বুক ভেঙে যাওয়া চাপা এক ধরনের কান্না। সেই কান্নার সঙ্গে সঙ্গে বিজাতীয় ভাষার কিছু কটূক্তি শোনা গেলো এবং প্রায় তক্ষুনি বাড়ি থেকে একজন মানুষ বের হয়ে এলো। মানুষটি লোহারা চেহারার, সাদাসিধে পোশাকের গ্রামের মানুষ। তার হাঁটার ভঙ্গি দেখে মনে হলো সে অপ্রকৃতিস্থ, কোনো মতে পা টেনে টেনে সে আমার কাছে এসে দাঁড়ালো। আমি দেখতে পেলাম সে অল্প অল্প কাঁপছে। আমি মানুষটির মুখের দিকে তাকালাম, তার মুখ মৃত মানুষের মতো রক্তহীন। আমি তার চোখের দিকে তাকালাম সেখানে আতঙ্ক, হতাশা, দুঃখ কিছু নেই, সেই চোখের দৃষ্টি পুরোপুরি ভাবলেশহীন, শূন্য। সেই শূন্য চোখের দৃষ্টি বর্ণনা দেওয়ার ক্ষমতা আমার নেই, সেদিকে তাকিয়ে হঠাৎ আমার মনে হলো এই পৃথিবী নিশ্চয়ই মিথ্যা, নিশ্চয়ই এটি মহাজাগতিক কোনো প্রাণীর একটি দুঃস্বপ্ন। এটি সত্যি হতে পারে না, কিছুতেই সত্যি হতে পারে না।

কিন্তু সেটি সত্যি ছিল, একদল মিলিশিয়া যখন এই মানুষটির স্ত্রীকে 'রেপ' করছিল—আমি কিছুতেই এর বাংলা প্রতিশব্দটি লিখতে পারলাম না, ঈশ্বর আমাকে ক্ষমা করুন, আমাকে যেন কখনো সেই শব্দটি লিখতে না হয়—মানুষটি তখন আমার পাশে দাঁড়িয়ে থরথর করে কাঁপছিল। আমি তার চোখের দিকে তাকিয়েছিলাম, সে যে শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়েছিল পৃথিবীর কাউকে যেন সেই শূন্য দৃষ্টিটি দেখতে না হয়।

তারপর দুই যুগ কেটে গেছে। পবিত্র কোরআন শরীফের সেই চমৎকার বাক্যটি পড়ে আমি মাঝে মাঝে এই পৃথিবীতে আমার বুকের মাঝে স্বর্গের উদ্যান খুলে দেওয়ার জন্য সমস্ত ঘৃণা, সমস্ত প্রতিহিংসা দূর করে দেওয়ার চেষ্টা করি কিন্তু পারি না। আমার চোখের সামনে অপ্রকৃতিস্থ একজন মানুষের চেহারা ভেসে ওঠে, একটি মেয়ের চাপা গলার কান্নার শব্দ শুনতে পাই, মানুষটি শূন্য দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে থাকে। মানুষের দৃষ্টিতে যখন দুঃখ থাকে সেটা অনুভব করা যায়, দৃষ্টিতে যখন হিংসা-ক্রোধ বা বিদ্বেষ থাকে সেটাও অনুভব করা যায়, দৃষ্টিতে যখন ভালোবাসা থাকে সেটা অনুভব করা খুব সহজ। কিন্তু

যখন একজন শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে সেই দৃষ্টিকে সহ্য করা যায় না। আমি সেটা সহ্য করতে পারি না।

আমার স্মৃতিতে এ রকম অসংখ্য ঘটনা বাসা বেঁধে আছে। আমি কেমন করে এর সব ভুলে গিয়ে বুকের ভিতর থেকে সব বিদ্বেষ বিষ সরিয়ে দেবো? এই পৃথিবীতে আমাকে কী আজন্ম নরকবাসী হয়েই কাটাতে হবে?

৩.

উনিশ শ একাত্তরের ইতিহাস কিন্তু দুঃখ-কষ্ট নিপীড়ন আর হিংস্রতার ইতিহাস নয়। একাত্তরের ইতিহাস হচ্ছে আমাদের বীরত্ব এবং মহত্ত্বের ইতিহাস। আমাদের শক্তির আর ভালোবাসার ইতিহাস। আমাদের ত্যাগের আর স্বপ্নের ইতিহাস। পাকিস্তান নামক দেশ এবং তার সেনাবাহিনী যখন তার সমস্ত শক্তি দিয়ে এই দেশটিকে আর দেশের মানুষকে ধ্বংস করার চেষ্টা করছে ঠিক তখন আমরা আবিষ্কার করেছি মানুষের বুকের ভিতর ভালোবাসা।

মনে আছে একাত্তরে এক সময় আমাদের পুরো পরিবার দুটি ছোট নৌকায় করে নদীর পানিতে ভেসেছি—কোথায় যাবো জানি না। ভয়াবহ একাত্তরে চারদিকে মৃত্যু হাত পেতে আছে, নদীর কালো পানির দিকে ভালো করে তাকালে একটি-দুটি মৃতদেহ ভেসে যেতে দেখা যাবে। একজন তখন নদীর তীর থেকে হাত নেড়ে ডেকে আমাদের তার বাড়িতে আশ্রয় দিয়েছিল। সেদিন ছিল মে মাসের ৮ তারিখ, ভরা পূর্ণিমার চাঁদ আকাশ আলো করে আছে। অপরিচিত মানুষের বাসায় রাত কাটাচ্ছি, হঠাৎ দেখি সেই অন্ধকারকে আড়াল করে আশ্রয়দাতা মানুষটি চুপি চুপি ঘর থেকে বের হয়ে যাচ্ছে। মানুষটির পরিচয় আমাদের জানা নেই, তার কী উদ্দেশ্য আমরা জানি না, নিঃশ্বাস আটকে আতঙ্কে আমরা কাঠ হয়ে বসে রইলাম। ঘণ্টাখানেক পর মানুষটি ফিরে এলো, ভিজে জবজবে, হাতে একটা জাল, কোমরে বাঁধা মাছের চুপড়ি। আমার মা জিজ্ঞেস করলেন, "কোথায় গিয়েছিলে বাবা?" মানুষটি কুণ্ঠিত গলায় বললো, "আপনাদের যে খেতে দেবো বাসায় সেরকম কোনো খাবার নেই। ভাবলাম নদীতে জাল ফেলে দেখি, কয়টা মাছ ধরতে পারি কিনা। মাছগুলো কুটে বসিয়ে দিচ্ছি। সঙ্গে চারটি ভাত ফুটিয়ে দিই মা-বাচ্চাগুলো কিছু খেতে পারবে।"

একাত্তরের অন্ধকার রাতে সম্পূর্ণ অপরিচিত মানুষের সেই ভালোবাসার স্পর্শের কথা আমি ভুলিনি। আমি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, মানুষের ওপর আমি আর কোনোদিন বিশ্বাস হারাবো না।

যুদ্ধ চলাকালে আমাদের পরিবারের সবাই ধীরে ধীরে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছি। আমি এবং আমার বড়ো ভাই ঢাকায়, অন্য ভাইবোন গ্রামের বাড়িতে, বাবা কোনো এক নদী তীরে সমাহিত। যুদ্ধ শেষে আমরা দুই ভাই মায়ের কাছে ফিরে যাচ্ছিলাম। সবে দেশ স্বাধীন হয়েছে, রাস্তাঘাট বন্ধ, ব্রীজ ভাঙা, গাড়ি চলছে না। সকাল থেকে হাঁটতে হাঁটতে রাত করে দিই। আমাদের পাশাপাশি হেঁটে যাচ্ছে অসংখ্য মুক্তিযোদ্ধা। আমাদের গল্প-উপন্যাস-সাহিত্য-চলচ্চিত্রে যে মুক্তিযোদ্ধার ছবি আঁকা হয় সেটি পূর্ণাঙ্গ নয়। সেখানে সব সময় তাদের চিহ্নিত করা হয় বুদ্ধিদীপ্ত-শিক্ষিত তরুণ ছাত্র; কিন্তু মুক্তিযোদ্ধাদের শতকরা আশি ভাগ ছিল গ্রামবাংলার চাষী-মজুর খেটে-খাওয়া মানুষ। তারা জটিল রাজনীতি-সমাজনীতি বোঝে না, তারা বোঝে সহজ সত্যটি—এই দেশ দখল করে নিয়েছে দানবেরা, তাদের হাত থেকে মুক্ত করে আনতে হবে দেশটিকে। দেশের ডাকে লাঙল ফেলে রেখে তারা অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছে, দেশ স্বাধীন হওয়ার পর অস্ত্র ফিরিয়ে দিয়ে গামছা কাঁধে আবার ফিরে যাচ্ছে তার আপনজনের কাছে, তার মাটি-গরু-ক্ষেত-ফসলের কাছে। তাদের কোনো উচ্চাশা নেই, পদকের লোভ নেই, চাকরির মোহ নেই, সম্মানের জন্য ক্ষোভ নেই, সুযোগের জন্য শ্যেনদৃষ্টি নেই। শীতের সকালে মাথায় গামছা জড়িয়ে সস্তা সিগারেট ভাগাভাগি করে টানতে টানতে গ্রাম্য কথাবার্তা বলতে বলতে তারা হেঁটে যাচ্ছে। গ্রামের রাস্তা ধরে সেই সাদাসিধে মানুষের সঙ্গে হেঁটে যেতে কি আনন্দ! আজ দুই যুগ পরে সেই স্মৃতির কথা মনে করে আমার শরীরে আনন্দের শিহরণ বয়ে যায়।

আমার বড়ো ইচ্ছে করে সেই নাম-না-জানা মুক্তিযোদ্ধাদের খুঁজে বের করে তাদেরকে বলি, 'আপনি ধান কাটা বন্ধ করে বা লাঙলের হাল ছেড়ে দিয়ে, নৌকার বৈঠা ছেড়ে দিয়ে বা মাছের জাল তুলে আমার কাছে একটু আসুন। আপনাকে কেউ কখনো ফুলের মালা দিয়ে সম্মান করেনি, কেউ আপনার বুকে পদক পরিয়ে দেয়নি; কিন্তু এই যে দেখছেন আকাশ আর ঐ যে দেখছেন মাটি আর ঐ যে বাতাস যেটি আমরা বুক ভরে নিঃশ্বাস নিই তার সব এসেছে আপনাদের জন্য। আপনারা সেটি আমাদের হাতে তুলে দিয়েছেন। আমরা, আমাদের সন্তানেরা, তাদের সন্তানেরা যতোদিন এই আকাশের দিকে তাকাবে,

এই মাটিতে পা ফেলে বুক ভরে নিঃশ্বাস নেবে, তারা আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে। কেউ হয়তো মুখ ফুটে বলবে না; কিন্তু সব কি মুখ ফুটে বলতে হয়?'

৪.

ডিসেম্বরের ১৬ তারিখে আমি ঢাকায়। পাকিস্তান সেনাবাহিনী আত্মসমর্পণ করেছে খবরটি যখন পেয়েছি তখন অন্ধকার হয়ে এসেছে, আমি সেই মুহূর্তে যাত্রাবাড়ীতে, ঢাকা শহরে আসতে পারিনি। পরদিন ভোরে পায়ে হেঁটে শহরে এসেছি, আকাশে সূর্য উঠেছে, বহুদিন পর সেই সূর্য তার নরম আলো ছড়িয়ে দিচ্ছে একটি মুক্ত স্বাধীন দেশের ওপর। আকাশে-বাতাসে এক অনাস্বাদিত উল্লাস, এক বিস্ময়কর উৎসব।

আমি হেঁটে হেঁটে মতিঝিলের কাছাকাছি এসেছি, বাণিজ্যিক এলাকা বলে এখানে রাস্তাঘাটে ভিড় একটু কম। হাঁটতে হাঁটতে অন্যমনস্কভাবে লক্ষ্য করলাম ছিন্নমূল মানুষেরা রাস্তায় শুয়ে আছে। আরো কিছুদূর হেঁটে হঠাৎ আমার খটকা লাগলো, এ দেশে ছিন্নমূল মানুষেরা রাস্তায় ঘুমায় সত্যি কিন্তু তাই বলে আজকের মতো দিনে এতো বেলাতেও রাস্তায় শুয়ে ঘুমাবে? আমি দ্রুত পায়ে হেঁটে কাছে এসে হঠাৎ করে হকচকিত হয়ে গেলাম। ফুটপাথে একটি পরিবারকে হত্যা করে শুইয়ে রাখা হয়েছে। বাবা, মা এবং তার দুজন ফুটফুটে মেয়ে। ছোট মেয়েটির বয়স চার কিংবা পাঁচ, বড়ো জন এগারো কি বারো। বাবা এবং মায়ের বয়স বেশি নয়, চেহারা এবং পোশাক দেখে বোঝা যায় তারা বিহারি। মৃতদেহ এখনো অবিকৃত। তাদেরকে হত্যা করা হয়েছে খুব বেশি সময় হয়নি, রক্ত এখনো জমাট বাঁধেনি। আমি শিশুটির মুখের দিকে তাকালাম, মৃত্যুর ঠিক পূর্ব মুহূর্তে তার কেমন লেগেছিল? এই ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর পৃথিবীর বিরুদ্ধে সে কি অভিযোগ করেছিল? কে জানে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে এই সম্প্রদায় পাকিস্তানের পক্ষ নিয়েছিল, এখন স্বাধীনতার পর তাদের কী নির্মমভাবে তার মূল্য পরিশোধ করতে হচ্ছে।

আমরা আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস লিখছি। ইতিহাস বড়ো নির্মম, সেখানে বীরত্বের পাশাপাশি বিশ্বাসঘাতকতার কথা লিখতে হয়, তার পাশে লিখতে হয় নৃশংসতার কথা। এখানেও আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের ত্যাগ এবং বীরত্বের পাশাপাশি রয়েছে এ দেশের এক শ্রেণী মানুষের বিশ্বাসঘাতকতা এবং তার সঙ্গে সঙ্গে রয়েছে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার

একটি কালো অধ্যায়। সেই কালো অধ্যায় নিয়ে কোনো লেখা আমার চোখে পড়েনি, কিন্তু আজ হোক কাল হোক আমাদের সেই অধ্যায়টির মুখোমুখি হতে হবে। দুর্বলতাকে এড়িয়ে থাকা যায় না তাকে জয় করতে হয়। দেশের স্বাধীনতা হচ্ছে একটি সন্তানের জন্মের মতো। মাতৃগর্ভের অন্ধকার থেকে আলোর মুখোমুখি আসতে হয় ভয়ঙ্কর যন্ত্রণার মাঝে দিয়ে, নবজাতক শিশুর শরীরে রক্ত ক্লেদ মাখা থাকে, নাড়ির সঙ্গে লাগানো থাকে জরায়ুর অন্তরাচ্ছদক। স্বাধীনতার সেই অপূর্ব শিশুটির শরীরেও ছিল প্রতিহিংসার রক্ত ক্লেদ গর্ভপরিস্রব নাড়ি। আমাদের সেই অপরিচ্ছন্ন রক্ত ক্লেদ থেকে ধুয়ে মুছে শিশুটিকে তুলে আনতে হবে— চোখ ফিরিয়ে রাখলে তো হবে না।

আমাদের দেশে এখনো অসংখ্য বিহারি সম্প্রদায়ের মানুষ রয়ে গেছে, যে কারণেই হোক স্বদেশ হিসেবে তারা পাকিস্তানকে বেছে নিতে চায়। তাদের মাঝে যারা বিত্তবান তারা সে দেশে চলে গিয়েছে। যারা রয়ে গেছে তারা দুঃস্থ এবং অসহায়। এ দেশে যে সমস্ত বিশ্বাসঘাতক পাকিস্তানের পক্ষ নিয়েছিল, সক্রিয়ভাবে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেছিল, গত পঁচিশ বছরে ধীরে ধীরে তাদের পুনর্বাসিত করা হয়েছে। যে সমস্ত বামপন্থী দল স্বাধীনতার বিরোধিতা করেছিল, তাদের কাজকর্মের সঙ্গে রাজাকারদের কোনো পার্থক্য নেই, তবুও তাদেরকে প্রাজ্ঞ রাজনীতিবিদ হিসেবে সম্মান দেখানো হয়; কিন্তু এই বিহারি সম্প্রদায় যারা ঘটনাচক্রের শিকার হয়ে এই দেশে পাকিস্তানের অধিবাসী হয়ে আটকা পড়ে আছে তাদেরকে মানুষের সম্মান না দিয়ে জেনেভা ক্যাম্প নামে একটি নির্মম জায়গায় মানবেতর জীবনযাপনে বাধ্য করা হয়েছে। মানুষ দুঃখ-কষ্ট সহ্য করতে পারে যদি সেটিকে সাময়িক বলে জানে—কিন্তু যখন পঁচিশ বছর ধরে সেই দুঃখ-কষ্টে বেঁচে থাকতে হয় তখন তারা সেটি কেমন করে সহ্য করবে? কী আছে তাদের ভবিষ্যতে দেওয়ার মতো?

নির্বাচনের পরপরই একজন সাংসদকে দুজন পতিতাসহ গ্রেফতার করা হয়েছিল। সাংসদটি কোন দলের, ঘটনাটি কি সত্যি না ষড়যন্ত্রমূলক সেটি নিয়ে বিতর্কে যাওয়ার আমার কোনো ইচ্ছা নেই। যে ব্যাপারে কোনো বিতর্ক নেই সেটি হচ্ছে পতিতা দুজন জেনেভা ক্যাম্পের দুজন তরুণী। নিজের দেশে যেতে পারছে না বলে যাদেরকে এ দেশের মাটিতে আশ্রয় দেওয়া হয়েছে তাদের যদি বেঁচে থাকার জন্য পতিতা বৃত্তি নিতে হয় সেই অপরাধের দায়দায়িত্ব কি আমাদের মাথা পেতে নিতে হবে না?

আজ স্বাধীনতার রজতজয়ন্তী, বিজয়ের রজতজয়ন্তী। কেউ আমাকে বলে দেয়নি, কোনো প্রাজ্ঞ ব্যক্তির রিপোর্ট পড়িনি, অর্থনীতির কোনো পরিসংখ্যান দেখিনি তবু আমি বাতাসের ঘ্রাণ থেকে বলতে পারি জাতি হিসেবে আমরা মাথা তুলে দাঁড়াতে যাচ্ছি। একটি জাতির যেটুকু শক্তি থাকতে হয় আমাদের সেটুকু আছে, আমরা তার প্রমাণ দিয়েছি, যেটুকু দুর্বলতা থাকার কথা সেটাও আছে। গত পঁচিশ বছর তার প্রমাণও দিয়েছি, কিন্তু আমাদের এমন একটি গুণ আছে যেটি অনেক জাতির নেই। আমরা অসম্ভব কষ্টসহিষ্ণু জাতি, অসংখ্যবার আমাদের আঘাত করে গুইয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে, প্রত্যেকবার আমরা মাথা তুলে দাঁড়িয়েছি। আমাদের আকাশছোঁয়া দাবি নেই, এক মুঠো খাবার, মাথার ওপরে একটু ছাউনি দিলেই আমাদের মুখে হাসি ফুটে ওঠে। পাঁচটি বছর যদি একটি দেশপ্রেমিক সরকার এই দেশের মানুষকে ধরে রাখতে পারে আমরা যে মাথা তুলে দাঁড়াবো কেউ কি সেটা অস্বীকার করতে পারবে? আমার ভাবতে বড়ো ভালো লাগে যে, মাথা তুলে দাঁড়ানোর সময়টি আমাদের নাগালের মাঝে, আমরা হাত বাড়ালেই সেটা স্পর্শ করতে পারবো।

স্বাধীনতার রজতজয়ন্তী বড়ো আনন্দের দিন। দুঃখ বুকের মাঝে গোপনে চেপে রাখতে হয়; কিন্তু আনন্দের অংশ দিতে হয় সবাইকে। আজ এই আনন্দের দিনে ক্যাম্পে ক্যাম্পে আটকে থাকা মানুষগুলোকে কি কোনোভাবে আমাদের আনন্দের অংশ দিতে পারি না?

—ভোরের কাগজ, ১৪ ডিসেম্বর ১৯৯৬।

আমি অভিশাপ দিই

যমুনা নদীর ওপর বিশাল সেতু তৈরি হচ্ছে। আজকাল মাঝে মাঝে খবরের কাগজে তার ছবি ছাপা হয়। কাজ অনেকদূর এগিয়ে এসেছে। সেতুটি মোটামুটি দাঁড়িয়ে গেছে, দেখে বড়ো ভালো লাগে। তবে কোনো একটি বিচিত্র কারণে এই ভালো লাগার সঙ্গে সঙ্গে আমি নিজের ভিতরে এক ধরনের জ্বালা অনুভব করি। পৃথিবীর শতকরা দুইভাগ মানুষ আমাদের দেশে বাস করে—অর্থাৎ পৃথিবীর প্রতি পঞ্চাশজন মানুষের একজন বাংলাদেশের, এর জনসংখ্যা প্রায় জাপানের সমান, যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় অর্ধেক অথচ এই দেশে আমরা এখনো যথেষ্ট ইঞ্জিনিয়ার, বিজ্ঞানী, প্রযুক্তিবিদ তৈরি করতে পারিনি যারা একটি সেতু তৈরি করতে পারে। যমুনার ওপরে সেতু তৈরি করার জন্য আমাদের বাইরের একটি দেশের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হলো। অথচ এমনটি হওয়ার কথা ছিল না, একই উপমহাদেশে একই পরিবেশের মধ্যে থেকে আমাদের পাশের দেশটি সম্পূর্ণ নিজের প্রযুক্তি ব্যবহার করে ফারাক্কা বাঁধ তৈরি করেছে (বাঁধটি যে কাজের জন্য তৈরি হয়েছিল সেটি ঠিক করে করতে পেরেছে কিনা সেই কথাটি আমাদের দেশের মানুষের থেকে ভালো করে আর কে জানে?)

শুধু কি যমুনা সেতু নিয়ে ক্ষোভ? না, আরো আছে। একটি আন্তর্জাতিক সম্ভ্রান্ত জার্নাল হাতে নিলে খুঁজে খুঁজেও কোথাও এই দেশের কোনো বিজ্ঞানীর গবেষণার কোনো চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যাবে না। হঠাৎ হঠাৎ একটি-দুটি পরিচিত নাম পাওয়া গেলে দেখা যাবে এ দেশের সেই সোনার ছেলের গবেষণা হয়েছে দেশের বাইরের কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে, অন্য কোনো গবেষণাগারে।

পৃথিবীর প্রতি পঞ্চাশজন মানুষের একজন বাংলাদেশের, তবু আমরা বাইরের পৃথিবীকে এখনো কিছু দিতে পারিনি। দেশের বাইরে যাওয়ার সময় মধ্যপ্রাচ্যের কোনো এয়ারপোর্টে খানিকক্ষণের জন্য থামতে হলে এ দেশের কিছু শ্রমজীবী মানুষ দেখা যায়, এয়ারপোর্ট ঝাড়ামোছা করছেন, জঞ্জাল সরিয়ে রাখছেন। মেধা নয়, তারা এসেছেন শারীরিক শ্রম দিতে; তাদের দেখে অহংকার

হয় না, বুকের ভিতরে এক ধরনের সমবেদনা অনুভব করতে হয়। ইউরোপ, যুক্তরাষ্ট্র বা উন্নতবিশ্বেও আমাদের অনেকে আছেন, কিন্তু তারা আছেন পুরোপুরি নিজেদের জন্য। সেখানে তারা নিজেদের পরিবার-পরিজনকে নিয়ে চমৎকার জীবনযাপন করছেন তার বেশি কিছু নয়।

বাইরের পৃথিবীর কাছে বাংলাদেশ খুব সম্মানজনক অবস্থায় নেই। স্বাধীনতার সময়েই দেশটিকে 'তলাহীন ঝুড়ি' বলে পরিচয় করে দেওয়া হয়েছিল, তারপর থেকে দুঃখ-কষ্ট, দারিদ্র্য আর ক্ষুধা হচ্ছে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস এবং বন্যা। 'বাংলাদেশের মতো গরিব' কথাটি আমি পাশ্চাত্য গল্প-উপন্যাসে পর্যন্ত দেখে অসংখ্যবার অপমানিত বোধ করে এসেছি। বাইরের পৃথিবী সযতনে এই দেশটিকে উপেক্ষা করে এসেছে, টেলিভিশনের খবরে কিংবা খবরের কাগজের প্রথম পৃষ্ঠায় এটি কখনো আসে না। শেষবার এটি হেডলাইন পেয়েছিল '৯৩ সালে—যখন তসলিমা নাসরিনকে দেশ ছাড়া করা হলো। বাংলাদেশের নানাবিধ বিশেষণের সঙ্গে তখন নতুন একটি পরিচয় যুক্ত হলো—এটি মৌলবাদীদের দেশ। এই দেশে একটি মেয়েকে হত্যা করার জন্য মৌলবাদীরা ছুটছে এবং দেশ তাকে রক্ষা করার মতো সাহস বা আগ্রহ দেখাচ্ছে না। ১৯৭৫ সালে যখন বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছিল তখন আরো একবার বাংলাদেশ বাইরের জগতে হেডলাইন পেয়েছিল, আমি তখন বাংলাদেশের ভিতরে, তাই কিভাবে খবরটি উপস্থাপন করা হয়েছিল আমি জানি না। যে মানুষটির কারণে একটি জাতি সংঘবদ্ধ হয়ে স্বাধীনতা অর্জন করেছিল তাঁকে সপরিবারে নৃশংসভাবে হত্যা করার কলঙ্ক বিদেশের মাটিতে আমাকেও দীর্ঘদিন বহন করে যেতে হয়েছে। বাংলাদেশের পরিচয় শুধু দুঃখ-কষ্ট, দারিদ্র্য, ক্ষুধা, ঘূর্ণিঝড়, বন্যা এবং মৌলবাদীতে নয়— তার পরিচয়ের সঙ্গে এই নৃশংসতাটুকুও যুক্ত হয়ে আছে।

বাইরের পৃথিবীতে বাংলাদেশের কোনো সম্মানজনক পরিচয় নেই, দেশটির জন্য আলাদা করে রাখা বিশেষণগুলো খুব নির্মম। এই একচেটিয়া প্রচারণার একমাত্র ব্যতিক্রম হচ্ছেন প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস। তার গ্রামীণ ব্যাংক কিভাবে পৃথিবীর সবচেয়ে হতদরিদ্র মানুষকে একটু আশা এবং স্বপ্নের মুখ দেখিয়েছে সেটি বাইরের পৃথিবীতে খুব আগ্রহ নিয়ে প্রকাশ করা হয়। এই সাফল্যের কথা বলার সময়েও আবার কিছু পরিসংখ্যান তুলে ধরে সব সময় মনে করিয়ে দেওয়া

হয়, বাংলাদেশ কিন্তু পৃথিবীর দরিদ্রতম একটি দেশ। প্রয়োজন থাকলেও বলা হয়, না থাকলেও বলা হয়।

আমরা আর কতোদিন এই পরিচয় বহন করবো?

২.

আমার খুব বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করে যে, এই পরিচয় আমাদের সারা জীবন বহন করতে হবে না। এই মুহূর্তে পৃথিবীতে একটি বিপ্লব হচ্ছে। খুব কম মানুষই তার জীবদ্দশাতে সত্যিকার একটি বিপ্লব দেখার সুযোগ পায়, সেদিক দিয়ে বিবেচনা করলে বলতে হবে, কাছাকাছি কয়েক দশকের মানুষ খুব ভাগ্যবান। শেষবার এ রকম একটা বিপ্লব হয়েছিল প্রায় দুইশত বছর আগে, সেটার নাম ছিল শিল্প বিপ্লব। যারা সেই বিপ্লবে অংশ নিয়েছিল পরবর্তী দুই শতাব্দী তারা বাকি পৃথিবীর ওপর রাজত্ব করেছে। তারা যুদ্ধ করেছে, যুদ্ধ জয় করেছে, শোষণ করেছে, শাসন করেছে। যে পাশ্চাত্য সভ্যতা দেখে আমরা মুগ্ধ হই—প্রাণপণে অনুকরণ করার চেষ্টা করি, সেই সভ্যতার জন্ম দিয়েছে।

শিল্প বিপ্লবের মতো ঠিক একই ধরনের আরেকটি বিপ্লব পৃথিবী জুড়ে শুরু হয়েছে, বাংলায় এই বিপ্লবটিকে বলা যায় তথ্য বিপ্লব। শিল্প বিপ্লব যেভাবে পৃথিবীর রূপ পাল্টে দিয়েছিল তথ্য বিপ্লব ঠিক একইভাবে পৃথিবীর রূপ পাল্টে দিতে শুরু করেছে। যারা এই বিপ্লবে অংশ নেবে ঠিক আগেরবারের মতো আবার হয়তো তারা পৃথিবীকে দুই শতাব্দী শাসন করবে, শোষণ করবে। যুদ্ধ শুরু করিয়ে দিয়ে সেই যুদ্ধ জয় করবে।

আগের বিপ্লবে আমরা অংশ নিইনি। তাই হাজার হাজার বছরের প্রাচীন সভ্যতা থাকার পরেও দুইশত বছর উপনিবেশ হয়ে কাটিয়ে দিতে হয়েছিল। এই তথ্য বিপ্লবে যদি অংশ না নেই তাহলে আবার আমরা অন্য কোনো জাতির উপনিবেশ হয়ে কাটিয়ে দেবো। কিন্তু সেটি আর কিছুতেই হতে দেওয়া হবে না। যেভাবেই হোক আমাদের এই বিপ্লবে অংশ নিতে হবে। তার কারণটি খুব সহজ, এই প্রথম একটি ব্যাপার ঘটতে যাচ্ছে যেটি আগে কখনো ঘটেনি। তথ্য বিপ্লব নামক এই রহস্যময় ব্যাপারটি আমাদের ধরাছোঁয়ার বাইরে নয়, দরিদ্র-দুঃখী দেশ বলে এই বিপ্লবে অংশ নেওয়া থেকে কেউ আমাদের সরিয়ে রাখতে পারবে না। আমরা ইচ্ছা করলেই এতে অংশ নিতে পারি।

এই তথ্য বিপ্লবটি একশত বছর আগে না ঘটে যে এখন ঘটছে তার কারণটি হচ্ছে কম্পিউটার নামক একটি বিশেষ যন্ত্র। কম্পিউটার একটি টুল (tool) ছাড়া আর কিছুই নয়। সেই হিসেবে এর ভিতরের যন্ত্রপাতি এবং একটি স্ক্রু-ড্রাইভারের মাঝে মৌলিক কোনো পার্থক্য নেই। তবে স্ক্রু-ড্রাইভার দিয়ে স্ক্রু খোলা এবং লাগানো ছাড়া আর বিশেষ কিছু করা যায় না। (আমি অবশ্য একজনকে চিনতাম, পরীক্ষার চাপে মাথা গরম করে সে তার বাম চোখটা স্ক্রু-ড্রাইভার দিয়ে তুলে নেওয়ার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু সেটি স্ক্রু-ড্রাইভার ব্যবহারের উদাহরণ নয়।) কম্পিউটারের বেলায় সেটি সত্যি নয়, কম্পিউটার দিয়ে কী কাজ করা যায় সেটি কম্পিউটারের ওপর নির্ভর করে না, সেটি নির্ভর করে কম্পিউটার-ব্যবহারকারীর সৃজনশীলতার ওপর। পৃথিবীর জ্ঞানভাণ্ডারে এককভাবে সবচেয়ে বেশি পরিমাণ জ্ঞান সঞ্চয় করার কৃতিত্ব যে যন্ত্রটিকে দেওয়া যায় সেটি একটি কম্পিউটার। এই কম্পিউটারটি ভয়েজার ১ নামের মহাকাশযানটিকে সৌরজগতের ভিতর দিয়ে নিয়ে গেছে, যাত্রাপথে বিভিন্ন গ্রহ, উপগ্রহ, গ্রহকণার ছবি তুলেছে এবং তার সম্পর্কে তথ্য পৃথিবীতে পাঠিয়ে গেছে। সবচেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপার হচ্ছে, সেই কম্পিউটারটি আজকালকার কম্পিউটারের তুলনায় একটি ছেলেমানুষি খেলনা ছাড়া আর কিছু নয়! পাড়ার মোড়ে মোড়ে যেসব কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে উঠেছে সেখানে আজকাল যেসব স্বল্পমূল্যের কম্পিউটার দেখতে পাওয়া যায় তার যে কোনো একটিও ভয়েজার ১-এর কম্পিউটার থেকে শতগুণ শক্তিশালী। বিজ্ঞানীরা পৃথিবীতে বসে এটাকে একাধিকবার প্রোগ্রাম করেছেন, নতুন পরিবেশে নতুন কাজ করার জন্য প্রস্তুত করেছেন। মানুষের সৃজনশীল প্রতিভার সঙ্গে একত্র হয়ে একটি ছেলেমানুষি কম্পিউটার একটি মহাকাশযানকে এক যুগেরও বেশি সময় নিয়ন্ত্রণ করে গিয়েছে, মানুষের জ্ঞানভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করে গেছে।

সেই কম্পিউটার দিনে দিনে শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। শুধু তাই নয়, এখন কম্পিউটারের সঙ্গে কম্পিউটারের যোগাযোগ ঘটেছে, পৃথিবী জোড়া নেটওয়ার্কিং শুরু হয়েছে। মানুষের যে বিশাল তথ্যের ভাণ্ডার একজন আরেকজনের কাছে আড়াল করে রাখতো, হঠাৎ করে সেটি সবার জন্য উন্মুক্ত হয়ে গেছে। উন্নত বিশ্ব এবং তৃতীয় বিশ্বের মৌলিক পার্থক্য ছিল তথ্যের পার্থক্য। একসময় উন্নত বিশ্ব তথ্যকে নিয়ন্ত্রণ করতো, এখন সেই নিয়ন্ত্রণটুকু নেই, তৃতীয় বিশ্বের একজন সাধারণ মানুষ আর উন্নত বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষমতাবান

মানুষের কাছে একই তথ্য পৌঁছে যেতে শুরু করেছে। তথ্যের এই আদান-প্রদান ব্যাপারটি মাত্র শুরু হয়েছে, এটি কিভাবে মোড় নেবে, শেষ পর্যন্ত কী হবে, সেটি কেউ জানে না। শুধু এটুকু বলা যায়, শেষ পর্যন্ত যেটাই ঘটুক সেটা পৃথিবীর ইতিহাসকে চিরদিনের মতো পাল্টে দেবে। ব্যাপারটি অনেকটা আলাদিনের চেরাগের সেই জিনের মতো, চেরাগ ঘষে তাকে নিয়ে আসা হয়েছে, তাকে আমরা কী করতে দেবো সেটা যেন ঠিক করতে পারছি না।

তথ্য বিপ্লবের মূল চালিকাশক্তি হবে কম্পিউটার আর সবচেয়ে আনন্দের ব্যাপার হচ্ছে, কম্পিউটার নামক এই বিস্ময়কর যন্ত্রটি অবিশ্বাস্য রকম স্বল্পমূল্যের। যারা সংবাদপত্রে এর দাম দেখে গোপনে দীর্ঘশ্বাস ফেলছেন তাদেরকে বলছি, এটি যে কাজ করতে পারে সেই তুলনায় এর মূল্য এতো কম যে, বলা যেতে পারে এটি প্রায় বিনামূল্যে বিতরণ করার পর্যায়ে চলে এসেছে। কম্পিউটার বিজ্ঞানীদের প্রিয় বক্তব্য হচ্ছে, 'কম্পিউটারের হার্ডওয়ার তো ফ্রি—সফটওয়ারটি হচ্ছে খরচ সাপেক্ষ।' এর কারণটিও সোজা। কম্পিউটার নামক যন্ত্রটি তৈরি হয় ফ্যাক্টরিতে একসঙ্গে লাখ লাখ। এর ভিতরকার সফটওয়্যারটিকে তৈরি করতে হয় মানুষের, কাজেই সেটি এতো খরচসাপেক্ষ। আর ঠিক এই জায়গাতেই হঠাৎ করে বোঝা যায় কেন বাংলাদেশের মতো একটি দেশ বিশাল সুযোগের সামনে মুখোমুখি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কম্পিউটার জিনিসটি প্রায় মূল্যহীন, বাংলাদেশের মতো দরিদ্র দেশও কাজ চালানোর মতো প্রায় সত্যিকার কম্পিউটারের ব্যয়ভার বহন করতে পারবে। এই সঙ্গে যদি কম্পিউটার-সম্পর্কে অভিজ্ঞ একটি জনশক্তি গড়ে তোলা যায় তাহলেই তথ্য বিপ্লবে অংশগ্রহণের জন্য ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়ে যাবে। আমাদের দেশে কম্পিউটার সম্পর্কে অভিজ্ঞ জনশক্তি এখনো গড়ে ওঠেনি। অল্প কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অল্প কয়েকটি কম্পিউটার সায়েন্স বিভাগ যথেষ্ট নয়, পড়াশোনা করছে সেরকম সকল ছাত্রছাত্রীকে কোনো-না-কোনো পর্যায়ে কম্পিউটারের শিক্ষা দিতে হবে। কেউ হবে সত্যিকারের বিশেষজ্ঞ, কেউ শুধু ব্যবহার করবে, কেউ প্রোগ্রামিং করবে আবার কেউ তথ্য আদান-প্রদানে সন্তুষ্ট থাকবে। আমরা একটি বিশাল সুযোগের মুখোমুখি হয়েছি, সারা পৃথিবীর জন্য এ রকম সুযোগ কয়েক শতাব্দীতে আসে একবার। বাংলাদেশের মতো দেশের জন্য আসে হয়তো কয়েক সহস্র বছরে একবার। এই সুযোগ যদি আমরা হেলায় নষ্ট করি সেটা হবে একটি জাতির আত্মহত্যা।

পৃথিবীর কোনো মানুষই অন্য কোনো মানুষ থেকে প্রতিভাবান নয় (হিটলার সেটা বিশ্বাস করতো না, তার ধারণা ছিল জাতিগতভাবে তারা অন্যদের থেকে শ্রেষ্ঠ— সেই বিশ্বাসের মূল্য সে এবং তার জাতি খুব খারাপভাবে দিয়েছিল।) তবে বিশাল সংখ্যার একটা ব্যাপার আছে। কেউ যদি দশ মিলিয়ন মানুষ থেকে সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষগুলো বেছে নেয়, তারা যেরকম মানুষ পাবে, তার অনেক বেশি ভালো মানুষ একশত মিলিয়ন মানুষ থেকে নেওয়া সম্ভব। কাজেই বাংলাদেশের প্রায় বারো কোটি মানুষের মাঝে থেকে যেসব ছেলেমেয়ে নানারকম বাধাবিপত্তি পার হয়ে শেষপর্যন্ত কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের দোরগোড়ায় এসে হাজির হয়, তারা পৃথিবীর সবচেয়ে মেধাবী ছেলেমেয়েদের থেকেও বেশি মেধাবী। আমি আমার ছাত্রছাত্রীদের সবসময়ই এই কথাটি বলে আসছি, কিন্তু তারা কখনো সত্যিকারভাবে আমাকে বিশ্বাস করেছে বলে মনে হয় না। (এ দেশের স্কুল-কলেজের পড়াশোনার পদ্ধতিটা আশ্চর্য রকম গুণনাশিনী, সবচেয়ে মেধাবী ছেলে কিংবা মেয়েটিকেও তার স্বাধীনভাবে চিন্তা করার ক্ষমতাকে পুরোপুরি নষ্ট করে কিছু তথ্যকে গিলে সেটাকে উগড়ে দেওয়া শিখিয়ে শিখিয়ে মোটামুটিভাবে একটা তোতা পাখিতে পরিণত করে দেয়— কিন্তু সেটা ভিন্ন বিষয়।)

এখন এই দেশের জন্য একটা খুব বিশেষ সময়, এ দেশের রেনেসাঁর যুগ যদি শুরু হয় তাহলে সেটা এখনই হবে। এখন আমরা দেখবো উৎসাহী ছাত্রছাত্রীরা স্কুল থেকে কলেজে ছুটছে, বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-শিক্ষক গবেষণা করছে, বিজ্ঞানী-ইঞ্জিনিয়াররা দেশ গড়ে তুলছে আধুনিক প্রযুক্তি দিয়ে। নতুন নতুন স্কুল-কলেজ তৈরি হবে, বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হবে, সর্বাধুনিক প্রযুক্তি শেখানো হবে পৃথিবীর সেরা ছেলেমেয়েদের। এখন আমাদের মানুষের দরকার। শিক্ষিত উৎসাহী কর্মঠ মানুষ, একজন নয়, দশজন নয়। হাজার হাজার মানুষ। এ দেশে হাজার নয়, লাখ লাখ মানুষ আছে, যারা শিক্ষিত হতে চায়।

কিন্তু আমরা কি প্রস্তুত শিক্ষা দেওয়ার জন্য?

৩.

আমরা প্রস্তুত নই। শুধু যে প্রস্তুত নই তাই নয়, প্রকৃতপক্ষে আমরা শিক্ষাব্যবস্থাটিকে পুরোপুরি ধ্বংস করার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছি। আমি নৈরাশ্যবাদী নই, আমার পরম শত্রুও আমাকে কখনো নৈরাশ্যবাদী অপবাদ দিতে পারবে না। ১৯৭১ সালেও যখন স্বজন হারিয়ে অভুক্ত নিরাশ্রয় হয়ে পাকিস্তান মিলিটারির

থাবা থেকে পালিয়ে পালিয়ে বনে বাদাড়ে ঘুরে বেড়িয়েছি তখনো আমি ভবিষ্যৎ নিয়ে স্বপ্ন দেখেছি। কিন্তু গত বছর এই দেশের শিক্ষাব্যবস্থার খুব কাছাকাছি থেকে আমি প্রথমবার সত্যিকারের এক নৈরাশ্যের কালো গহ্বরের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছি। আমি জানি না, কেন খুব যত্ন করে সুপরিকল্পিতভাবে এই দেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে ধ্বংস করে দেওয়া হচ্ছে। যারা করছেন তারা এটি জানেন না সেটি হতে পারে না, তারা সেটি খুব ভালো করে জানেন। তবু তারা এটি করছেন। কারণ এই দেশের জন্য তাদের কোনো মমতা নেই। তারা এ দেশের সবচেয়ে হৃদয়হীন সম্প্রদায়— তারা হচ্ছেন এই দেশের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ।

কথাটি খুব রূঢ় শোনাতে পারে কিন্তু কথাটি সত্যি। এই দেশের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের দেশের জন্য কোনো মমতা নেই, তাদের সমস্ত শক্তি ব্যয় হয় ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য এবং ক্ষমতায় থাকার জন্য। নিজেদের নিয়ে তাদের স্বপ্ন আছে, কিন্তু এই দেশকে নিয়ে তাদের কোনো স্বপ্ন নেই। যদি থাকতো তাহলে তারা দেশের ছাত্রদের এত বড় সর্বনাশ করতে পারতেন না। ছাত্র রাজনীতির নামে যে ভয়ঙ্কর মধ্যযুগীয় বর্বরতাকে গ্রহণযোগ্য করে তোলা হয়েছে সেটি ঘটতে দিতেন না। দেশ সম্পর্কে, দেশের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তাদের নিজস্ব হিসাব-নিকাশ নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু তার মধ্যে শিক্ষার কোনো স্থান নেই। তাদের কাছে ছাত্র হচ্ছে একটি রাজনৈতিক হাতিয়ার, তাদেরকে ক্ষমতায় নেওয়ার কিংবা ক্ষমতায় রাখার একটি অস্ত্র মাত্র। একজন ছাত্র একজন ভবিষ্যৎ ডাক্তার, একজন ভবিষ্যৎ নেতা, জাতীয় পরিষদের সদস্য কিংবা ভবিষ্যৎ মন্ত্রী। তারা কখনোই ভবিষ্যতের শিক্ষাবিদ-বিজ্ঞানী-দার্শনিক নয়। সেটি যে হতে পারে, আমাদের দেশের রাজনৈতিক নেতারা সেটি জানেন পর্যন্ত না।

'৫২, '৬৯ বা '৭১- এ ছাত্র রাজনীতির যে ভূমিকা ছিল এখন তার বিন্দুমাত্র অবশিষ্ট নেই। কাউকে যদি বর্তমান ছাত্র রাজনীতির মূল্যায়ন করতে বলা হয় তাহলে সেটি করা হবে এভাবে :

> 'এর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে একটি এলাকায় নিজের প্রাধান্য সৃষ্টি করা। সেটি সৃষ্টি করার জন্য মধ্যযুগীয় বর্বরতা বা অমানুষিক নৃশংসতা প্রদর্শন করায় কোনো বাধা নেই, বরং সেটিই কাঙ্ক্ষিত ব্যাপার, কারণ যত বড়ো অপরাধই করা হোক আইন কখনোই স্পর্শ করবে না। নৃশংসতা প্রদর্শন করেই নিজেকে বড়ো ক্যাডার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা যায়— এবং এটিই হচ্ছে একটি এলাকার অর্থনৈতিক লেনদেনের ভাগবাঁটোয়ারায় অংশ নেবার একমাত্র গ্যারান্টি।'

ছাত্র রাজনীতি নামের যে ব্যাপারটি চালু রয়েছে সেটি সম্পর্কে যদি কেউ এর থেকে মহৎ কোনো মূল্যায়ন করতে পারেন, আমি তার সঙ্গে যে কোনো ধরনের বিতর্কে বসতে রাজি আছি। কারণ, আমি জানি আমার এই উক্তিটি কোনো অসহায় ক্ষোভের কথা নয়, এটি একটি বাস্তব সত্য। আমি নিজের চোখে দেখে এটা শিখেছি, কারো বাসায় বেড়াতে গিয়ে ড্রয়িং রুমে চা খেতে খেতে হালকা আলাপ থেকে শুনে আসিনি। আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিয়েছিলাম ছাত্রদেরকে পড়ানোর জন্যে, অবসরে গবেষণা করার জন্যে। কিন্তু আমার সময়ের একটা বড়ো অংশ ব্যয় হয় ছাত্র রাজনীতির কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের নানাধরনের নৃশংসতার তদন্ত করতে গিয়ে। আমি যতো তাড়াতাড়ি এই বিষয়গুলো শিখেছি, মনে হয় আর কেউ বুঝি এটা এতো তাড়াতাড়ি শেখেনি।

ছাত্র রাজনীতির সবচেয়ে দুঃখের অংশটি কী? সেটি হচ্ছে, এর নাম দিয়ে যে অমানুষিক নৃশংসতা করা হয়, সেটি কিন্তু জেল থেকে পালিয়ে আসা কোনো ফেরারি খুনি আসামি করে না। সেটি করে প্রায় কিশোর কোনো একটি ছাত্র। সেটি দূরের কোনো মানুষ নয়। প্রায় সময়েই আমাদের খুব কাছের মানুষ। পরিচিত কারো সন্তান, কারো ভাই। সমাজের বাইরের একজন খুনি বা পেশাদার অপরাধীর নৃশংসতা হয়তো সহ্য করা যায়, কিন্তু নিজের ভালোবাসার সন্তান যখন নিষ্ঠুর খুনিতে পাল্টে যায়, সেটা কি সহ্য করা এতো সহজ?

৪.

ছাত্র রাজনীতির সবচেয়ে ভয়ঙ্কর অংশটি কী? সেটি হচ্ছে এ ব্যাপারে আইনের ঔদাসিন্য। সকলের সামনে প্রকাশ্যে জঘন্যতম অপরাধটি করা হলেও একজন ছাত্র যদি যে কোনোভাবে রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত থাকে, সে সবসময়েই আইনের ঊর্ধ্বে। আইন তাদের কখনো স্পর্শ করে না। শুধু যে স্পর্শ করে না তাই নয়, স্পর্শ করার চেষ্টাও করে না। ব্যাপারটি আমি প্রথমে যেদিন আবিষ্কার করেছি, আমার বিস্ময়ের অবধি ছিল না। একটি ছাত্র গুলি খেয়ে হাসপাতালে গিয়েছে খবর পেয়ে আমরা কয়েকজন শিক্ষক গাড়ি করে যাচ্ছি, ঘটনাস্থলের কাছে দিয়ে যাওয়ার সময় পুলিশের সঙ্গে দেখা। গাড়ি থামিয়ে পুলিশকে ঘটনাটা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। পুলিশ অফিসারটি খুব উৎসাহ নিয়ে আমাদেরকে ঘটনাটির একটি বিশদ বর্ণনা দিলো। তার উপস্থিতির দশ গজের ভিতর হত্যাকাণ্ডের উদ্দেশ্যে একটি গুলিবর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। শুধু বাংলাদেশে নয়, পৃথিবীর যে কোনো দেশের আইনে কাউকে হত্যা করার চেষ্টার

থেকে ভয়ঙ্কর কোনো অপরাধ হতে পারে না। কিন্তু পুলিশ অফিসারটি একটিবারও এই অপরাধীকে থামানোর বা ধরার চেষ্টা করেনি। সেটি নিয়ে তার ভিতরে কোনো লজ্জা বা সংকোচও নেই। আমি তার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ করে বুঝতে পেরেছিলাম, একজন সাধারণ মানুষকে যে কাজের জন্যে অপরাধী বিবেচনা করা হয় একজন ছাত্রের বেলায় সেটি সত্যি নয়—তার জন্যে সেটি হচ্ছে রাজনীতি। রাজনীতির উদ্দেশ্যে হত্যা করার চেষ্টা করা হলেও সেটি আর অপরাধ নয়।

বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় কোনো আইন নেই। কোনো রাজনৈতিক সংগঠনের সাথে যুক্ত হলে যে কোনো অপরাধ করা সম্ভব। আমার স্বল্পকালীন বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে প্রত্যেকটি ছাত্র সংগঠনকেই কোনো-না-কোনো অপরাধ করতে দেখেছি কিন্তু কখনোই তাদেরকে আইনের মুখোমুখি হতে দেখিনি। পুলিশ কেস এখানে আনুষ্ঠানিকতা, এর বিন্দুমাত্র গুরুত্ব নেই (স্বরাষ্ট্র দফতরের কেউ কি আমাকে চ্যালেঞ্জ করবেন?)। আমি জানি, শত শত ছাত্রের সামনে জঘন্যতম অপরাধ করার পরেও একজন অপরাধীকে কখনোই আইনের সামনে হাজির করা যাবে না। কারণ, নিরাপত্তার ভয়ে কখনই একজন ছাত্র সামনে এগিয়ে আসবে না। আমাদের রাজনৈতিক নেতারা শুধু যে সন্ত্রাসীদের লালন করে তাদেরকে দানবে পরিণত করেছেন তাই নয়, সাধারণ ছাত্রদেরকে পরিণত করে ফেলেছেন ভীরু মেরুদণ্ডহীন কাপুরুষে। মুখ বুঁজে মাথা নিচু করে অন্যায় সহ্য করা এখন একটি শিল্পের পর্যায়ে চলে এসেছে। আমাদের কি দেখতে ইচ্ছা করে না তেজস্বী ছেলেকে, যে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে উঠবে?

৫.

আমি এখন যে বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ করছি এটিকে এক সময় সন্ত্রাসহীন, সেশনজটহীন বিশ্ববিদ্যালয় বলে মনে করা হতো। এটি এখন আর সন্ত্রাসহীন বিশ্ববিদ্যালয় নয়, এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস একাধিকবার ছাত্রদের রক্তে রঞ্জিত হয়েছে। এটি সম্ভবত আর নিজেকে সেশনজটহীন বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে দাবি করতে পারবে না। ফেব্রুয়ারির ২২ তারিখ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা শুরু হওয়ার কথা ছিল, প্রশ্ন ছাপা হয়ে গেছে, পরীক্ষার রুটিন দেওয়া হয়ে গেছে, পরীক্ষার সিট ফেলা হয়ে গেছে, ঠিক এই সময় ফেব্রুয়ারির ১৯ তারিখ রাত্রিবেলা ছাত্রদের দুটি রাজনৈতিক অঙ্গ সংগঠনের মধ্যে হঠাৎ করে একটি ব্যাপক ভায়োলেন্স শুরু হয়ে গেলো। বিশ্ববিদ্যালয় সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ করে দিতে

হলো। পরীক্ষা পিছিয়ে গেলো আড়াই মাস। বিশ্ববিদ্যালয়ের ২ হাজার ছাত্রছাত্রী, দেড় শতাধিক শিক্ষক, কয়েক শ কর্মকর্তা-কর্মচারীর জীবন থেকে এই সময়টুকু ঝরে গেল সম্পূর্ণ বিনা কারণে। পৃথিবী এগিয়ে যাচ্ছে, বিজ্ঞান-প্রযুক্তিও এগিয়ে যাচ্ছে পায়ে পায়ে, বিশাল একটি বিপ্লব ঘটতে যাচ্ছে সারা পৃথিবীতে; আমরা জানি, এই বিপ্লব আমাদের শেষ সুযোগ—এটিতে আমাদের অংশ নিতেই হবে। পৃথিবীর সেরা মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে আমরা এগিয়ে যেতে চাই সামনে, কিন্তু আক্ষরিক অর্থে অস্ত্র হাতে আমাদের দিকে লেলিয়ে দেয়া হচ্ছে দুর্বৃত্তদের। সমস্ত শক্তি ব্যয় করে একটু একটু করে একটি জিনিস দাঁড় করানো হয়, একটিমাত্র অর্বাচীন ছেলে এসে তাসের ঘরের মতো সেটাকে ধসিয়ে দিতে পারে এক মুহূর্তে। তাকে নিষেধ করার কেউ নেই, তাকে থামানোর কেউ নেই।

পুরো ব্যাপারটি এখন একটি যুদ্ধের মতো, সত্যিকার যুদ্ধে শত্রু চিহ্নিত থাকে। এই যুদ্ধটি বড়ো বিচিত্র, এই যুদ্ধে শত্রু চিহ্নিত নেই। কিন্তু যুদ্ধের মতোই এখানে রক্তক্ষরণ হতে থাকে। কতোদিন চলবে এই যুদ্ধ আমি জানি না, শেষ পর্যন্ত কে জয়ী হবে সেটাও জানি না। শুধু জানি, আমাদের সকলের এই যুদ্ধ করে যেতে হবে; এছাড়া তো আমাদের আর কিছু করার নেই।

৬.

আমাকে যদি সুযোগ দেওয়া হতো তাহলে এই দেশের প্রতিটি রাজনৈতিক নেতার কাছে গিয়ে আমি হাতজোড় করে বলতাম, আপনাদের কাছে আমি দুটি জিনিস ভিক্ষা চাই। এক, আপনাদের ছাত্র সংগঠনগুলি বাতিল করে দিন। দুই, হরতাল-ধর্মঘটের সময় যেভাবে হাসপাতাল, চিকিৎসাকেন্দ্র তার আওতামুক্ত থাকে ঠিক সেভাবে স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়কে তার আওতামুক্ত রাখুন।

তারা আমার কথা শুনতেন কিনা জানি না। যদি না শুনতেন তাহলে আমি তাদের চোখের দিকে তাকিয়ে বলতাম, দেশের সমস্ত মানুষের পক্ষ থেকে, সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের পক্ষ থেকে, তাদের বাবা-মা-ভাই-বোন-প্রিয়জনের পক্ষ থেকে আমি আপনাদের অভিশাপ দিই। দেশকে ধ্বংস করার জন্যে অভিশাপ দিই। নিজের সন্তানকে রক্ষা করে অন্যের সন্তানকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেওয়ার জন্য আমি আপনাকে অভিশাপ দিই।

আমি এর আগে কখনো অভিশাপ দিইনি; এর আগে আমি কখনো এতো অসহায়, এতো নিরুপায় বা অক্ষমও অনুভব করিনি।

—ভোরের কাগজ, ২৬ মার্চ ১৯৯৭।

লাল নীল শিক্ষক

ছাত্ররা রাজনীতির নাম করে মারপিট করে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে রেখেছে, এরকম সময় নিরীহ গোছের একজন ছাত্র আমার কাছে জানতে চাইলো কবে থেকে ক্লাস শুরু হবে। কোনো কারণে আমি সেদিন তিরিক্ষি মেজাজে ছিলাম, ছাত্রটির দিকে রক্তচক্ষু করে বললাম, "আমাকে কেন জিজ্ঞেস করছো?"

ছেলেটা দুর্বল গলায় বললো, "তাহলে কাকে জিজ্ঞেস করবো?"

আমি কঠিন গলায় বললাম, "বরং আমিই তোমাকে জিজ্ঞেস করি। বলো, কবে খুনখারাবি বন্ধ করে আমাদের ক্লাস নিতে দেবে?"

"স্যার, আমরা তো কিছু করিনি?"

"তাহলে কে করেছে?"

"কিছু ছাত্র।"

"তুমি কি ছাত্র না? তোমাদের কেউ কেউ কি এই ঘটনা ঘটায়নি?" আমি আঙুল দিয়ে ছেলেটিকে দেখিয়ে বললাম, "তুমি যেহেতু একজন ছাত্র তোমাকেও অন্য ছাত্রের কাজকর্মের দায়িত্ব নিতে হবে। যারা এখানে "গুলি করে" তুমি তাদেরই একজন।"

ছাত্রটি আহত মুখে আমার দিকে তাকিয়ে রইলো, কি বলবে বুঝতে পারলো না।

কিছুদিন পরের ঘটনা। শহরের কোনো এক অনুষ্ঠানে একজন মানুষ আমার দিকে এগিয়ে এলেন। যেহেতু আমি বাচ্চা-কাচ্চাদের দু'একটি বই লিখেছি সেই হিসেবে অনেকের ধারণা, আমি সমাজ-সাহিত্য-শিল্প এসব গুরুগম্ভীর বিষয় নিয়ে অনেক কিছু জানি, তারা কৌতূহল নিয়ে এসব আলোচনা করতে আসেন। আমি গুরুতর বিষয়ের আলোচনায় হাঁ হাঁ করে কাটিয়ে দেই। আজকে অবশ্যি সে সমস্যা হলো না। যিনি কথা বলতে এগিয়ে এসেছেন তিনি নিজে থেকেই অনেক কথা বলে গেলেন। শিল্প-সাহিত্য-সমাজ শেষ করে শিক্ষা নিয়ে কথা বলতে

বলতে হঠাৎ করে থেমে গিয়ে বললেন, "এই দেশের শিক্ষার বারোটা বেজে গেছে।"

"বারোটা বেজে গেছে?"

"হাঁ।"

"কেন?"

"আপনারা যেভাবে পলিটিক্স শুরু করেছেন— ঘেন্না ধরে যায়।"

"আমরা?"

মানুষটা কঠিন মুখে বললো, "হ্যাঁ, আপনারা। ইউনিভার্সিটির মাস্টাররা। আপনারা লাল রঙের মাস্টার, নীল রঙের মাস্টার। ছাত্রদের নিয়ে পলিটিক্স করেন— ছেঃ!"

আমি অপমানিত হয়ে প্রতিবাদ করে কিছু একটা বলতে গিয়ে থেমে গেলাম। মাত্র কিছুদিন আগে নিরীহ একটা ছাত্রকে ছাত্ররাজনীতি সংক্রান্ত সন্ত্রাসী কাজের জন্য দোষারোপ করেছি। যদি সেই ছাত্রটিকে তার সহপাঠীদের সন্ত্রাসী কাজের দায়ভার নিতে হয় তাহলে আমি কেন অন্য শিক্ষকদের রাজনীতির দায়ভার না নিয়ে পার পাবো? আমি মাথা নিচু করে মানুষটির গালাগাল হজম করে নিলাম। দেশের সবচেয়ে বড়ো বিদ্যাপীঠ বিশ্ববিদ্যালয়, সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সম্পর্কে কতোজন মানুষের এ রকম নীচ ধারণা রয়েছে? কেউ কি একবার সমীক্ষণ নিয়ে দেখবেন? আমার ধারণা সমীক্ষণ নেওয়া হলে লজ্জায় আমরা কেউ মুখ দেখাতে পারবো না। আসলে আমরা কী, সেই সত্যিটি চাপা পড়ে যাবে সাধারণ মানুষ আমাদের সম্পর্কে কী ভাবে— তার গ্লানিতে।

আমি যুক্তরাষ্ট্র থেকে পাকাপাকিভাবে দেশে ফেরার আগে '৯২ সালে একবার এসেছিলাম, দেশে কোনো-একটা কাজকর্ম গুছিয়ে নেওয়ার জন্য। শখ ছিল দেশের কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করার, খুব সঙ্গত কারণেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আমার পছন্দের তালিকার সবচেয়ে ওপরে। জীবনের সবচেয়ে আনন্দময় এবং গুরুত্বপূর্ণ সময়টুকু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কাটিয়েছি। সেই যুগে তিন বছর পরপর অনার্স পরীক্ষা হতো। আমরা এই তিন বছর গায়ে হাওয়া লাগিয়ে ঘুরে বেড়াতাম। পরীক্ষার আগের তিন মাস দরজা বন্ধ করে পড়ে কেল্লা ফতে করে দেবো এ রকম পরিকল্পনা করে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাকি জীবনটুকু ক্যান্টিনে চা-সিগারেট খেয়ে, কার্জন হলের লনে আড্ডা মেরে এবং টি. এস.

সি. তে নাটক করে কাটিয়ে দিতাম। পরীক্ষার আগের তিন মাসের অংশটুকু ছেড়ে দিলে বাকি সময়টুকুর স্মৃতি বড়োই মধুর। কাজেই নিজের দেশে কর্ম জীবন শুরু করার আগে প্রথমেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা মনে পড়বে বিচিত্র কী?

একদিন বিশ্ববিদ্যালয়ে খোঁজ নিতে গেলাম। আমরা যখন ছাত্র ছিলাম তখন যারা শিক্ষক ছিলেন তাদের অনেকেই এখনো আছেন, কেউ কেউ এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের খুব গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় আছেন। আমি এতো খবর না নিয়েই পরিচিত একজন শিক্ষকের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। তিনি এখনো আমাকে সাবেক ছাত্র হিসেবে খুব স্নেহ করেন, দেশে ফিরে আসছি শুনে খুব খুশি হয়ে উঠলেন। বললেন, "এই তো চাই। দেশের ছেলেরা যদি দেশে ফিরে না আসে তাহলে কেমন করে হবে? তবে হ্যাঁ, বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেওয়ার নিয়মকানুন আছে। খবরের কাগজে সার্কুলার হবে, এপ্লিকেশন করবে, সিলেকশন কমিটি বসবে—"

আমি মাথা নেড়ে বললাম, "আমি সেসব জানি।"

"আরো একটা ব্যাপার।"

"কি ব্যাপার?"

"তোমাকে নিয়ে আমাদের দিক থেকে কোনো সমস্যা নেই। তবে অন্যেরা—"

"অন্যেরা?" আমি অবাক হয়ে বললাম, "অন্যেরা কারা?"

আমার ছাত্রজীবনের শিক্ষক প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বললেন, "তুমি বরং এক কাজ করো।"

"কি কাজ?"

"তুমি 'অমুক' স্যারের সঙ্গে দেখা করো।"

তিনি "অমুক স্যার" হিসেবে যে শিক্ষকের নাম বললেন, তিনিও আমার শিক্ষক। দেশে এলে এমনিতেই আমি তাদের সবার সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করি। আমি ঘাড় নেড়ে বললাম, "ঠিক আছে, দেখা করবো।"

"হ্যাঁ, দেখা করে তাকে তুমি বলো যে, তুমি এই ডিপার্টমেন্টে জয়েন করতে চাইছো। কিন্তু একটা জিনিস খুব সাবধান।"

আমি ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "কি জিনিস?"

"তুমি যে আমার সঙ্গে দেখা করেছো সেটা কিন্তু বলো না।"

"বলবো না?"

"না। কিছুতেই বলবে না।"

আমি মাথা নেড়ে হকচকিতের মতো 'অমুক' স্যারের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। তিনিও আমার একজন প্রিয় শিক্ষক। আমাকে দেখে খুব খুশি হলেন, দেশে ফিরে আসতে চাইছি শুনে আরো বেশি খুশি হলেন। খানিকক্ষণ এটা-সেটা নিয়ে কথাবার্তা বলে হঠাৎ চিন্তিতমুখে বললেন, "তোমাকে নিয়ে মনে হয় কোনো সমস্যা হবে না।"

"সমস্যা?" আমি ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "কি সমস্যা স্যার?"

স্যার আমার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে বললেন, "রিস্ক নিয়ে কোনো কাজ নেই। তুমি এক কাজ করো।"

"কি কাজ?"

"তুমি "অমুক" স্যারের সঙ্গে দেখা করো।"

অমুক স্যার হিসেবে তিনি যে শিক্ষকের নাম করলেন তিনি সেই প্রথম শিক্ষক যার সঙ্গে আমি প্রথম দেখা করেছি এবং যিনি আমাকে এখানে পাঠিয়েছেন।

আমি ঢোঁক গিলে বললাম, "দেখা করবো।"

"আর শোনো", আমার স্যার নিচু গলায় বললেন, "তুমি যে আমার সঙ্গে আগেই দেখা করেছো সেটা কিন্তু বলো না। খবরদার।"

আমি মাথা নাড়লাম, "না, বলবো না।"

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আমার বড়ো প্রিয় বিশ্ববিদ্যালয়, আমার জীবনের মধুরতম স্মৃতি এই বিশ্ববিদ্যালয়কে ঘিরে, তবুও আমি শেষ পর্যন্ত এখানে শিক্ষকতার জন্য চেষ্টা করিনি। আমাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে শিক্ষকতার সবচেয়ে সম্মানজনক কাজটির জন্য আবেদন করার আগেই ক্ষমতাশালী দলগুলোর অনুগ্রহ ভিক্ষা করার একটি অসম্মানজনক কাজ করে আসতে হবে! সেই ছলনাটুকু করতে আমার দ্বিধা হলো।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান ছাত্র রাজনীতি নিয়ে আমার নিজস্ব কিছু চিন্তাভাবনা আছে। আমাদের সর্বজন শ্রদ্ধেয় রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ ছাত্র

রাজনীতি নিয়ে ঠিক আমার মনের মতো কিছু সত্যি কথা বলার পর আমি ভোরের কাগজে সেই বিষয় নিয়ে কিছু লেখালেখি করেছি। অসংখ্য পাঠক আমাকে চিঠি লিখে আমার বক্তব্যকে সমর্থন করেছেন। ভোরের কাগজেও এই বিষয় নিয়ে এক-দুজন ছাত্র, কিছু অভিভাবক চিঠিপত্র-প্রতিবেদন লিখেছেন। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বড়ো বড়ো প্রফেসরদের কেউ কেউ আমাকে আমার লেখার জন্য আড়ালে অভিনন্দিত করেছেন। কিন্তু সবচেয়ে রহস্যের ব্যাপার, এই বিষয়টি নিয়ে বাংলাদেশের বড়ো বড়ো বিশ্ববিদ্যালয়ের বড়ো বড়ো প্রফেসরদের কেউ প্রকাশ্যে মুখ খোলেননি। তারা যদি গোপনে আমার বক্তব্যকে সমর্থন করতে পারেন তাহলে প্রকাশ্যে সেই কথাটি বলতে দ্বিধা কেন? আমার মতো দু'চারজন 'প্যাকরা' তাদের ছোট হাতুড়ি নিয়ে টুকটুক করে যাচ্ছি, এক-দুইজন আমার কি তাদের বিশাল গদার এক ঘা দিতে পারেন না?

অবশ্যই পারেন, কিন্তু তারা দিচ্ছেন না। আমার ধারণা ব্যাপারটা জটিল। ছাত্র রাজনীতি যেরকম ছাত্রদের আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছে, শিক্ষকদের রাজনীতিও ঠিক সেভাবে শিক্ষকদের বেঁধে রেখেছে। শুধু তাই নয়, মনে হয় দুটির মাঝে এক ধরনের সম্পর্কও আছে। ছাত্র রাজনীতি এবং শিক্ষক রাজনীতি যেন এক পরিবারের দুই ভাই হাত ধরাধরি করে বড়ো হচ্ছে।

অক্টোবরের ৯ তারিখ 'আজকের কাগজ'-এর শেষ পৃষ্ঠায় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপরে একটি বড়ো প্রতিবেদন বের হয়েছে। আমি সেখান থেকে খানিকটা তুলে দিচ্ছি : 'রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে বিএনপিপন্থী সাদা গ্রুপের অবস্থা খুব শক্তিশালী না হলেও তাদের চিন্তা সুদূর প্রসারী। বিএনপিপন্থীদের একটি গ্রুপ জামাতের সঙ্গে অবস্থান করলেও বৃহত্তর অংশটি আওয়ামী লীগের সঙ্গে ক্ষমতা ভাগাভাগি করে নিয়ে ছাত্রদলকে ক্যাম্পাসে প্রতিষ্ঠিত করায় মনোযোগী। এই বৃহত্তর অংশটি মনে করছে রাকসু নির্বাচনে ছাত্রদল পূর্ণ প্যানেলে বিজয়ী হলে তারা ক্যাম্পাসের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করতে পারবে, এজন্য তারা খুব কৌশলে পা ফেলছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে সবচেয়ে নাজুক অবস্থায় রয়েছে জামাতপন্থী সবুজ গ্রুপ। . . . ' ইত্যাদি ইত্যাদি।

শিক্ষকদের হেয় করার জন্য এই প্রতিবেদনটি লেখা হয়নি, বরং এটি লেখা হয়েছে তাদের প্রশংসা করে। যে জিনিসটি ভালো করে লক্ষ করার মতো সেটি হচ্ছে শিক্ষকদের পরিচয় করিয়ে দেওয়ার ঢংটি। এক সময়ে তাদেরকে একটি রং দিয়ে প্রকাশ করা হতো (শুনেছি সেটি নির্বাচনী প্যানেলের কাগজের রং)।

ইদানীং রাখঢাক না রেখে বিএনপিপন্থী বা আওয়ামী লীগপন্থী বলা হয়। ওপরে যে লেখাটি উল্লেখ করেছি সেখানে আরো এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে 'পন্থী' শব্দটুকু তুলে দিয়ে সরাসরি 'আওয়ামী লীগ' বা 'জামাতি' বলা হয়েছে। যারা লিখেছেন তাদের এভাবে লিখতে দ্বিধা হয় না। যারা পড়ছেন তাদেরও সংকোচ হয় না। আমরা সবাই স্বীকার করে নিয়েছি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা বিশ্ববিদ্যালয়েই সবাইকে নিয়ে রাজনীতি করবেন। আমরা সবাই দলভুক্ত। রাজনৈতিক দলের পরিচয়টি আমার প্রথম পরিচয়।

শিক্ষকতার কাজটি চাকরি নয়—এটি জাতির সঙ্গে বা সমাজের সঙ্গে আত্মত্যাগের এক ধরনের অঙ্গীকার। বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক যে বেতন নিয়ে তার চাকরি শুরু করেন, ঢাকা শহরের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা তাদের ড্রাইভারকে তার চেয়ে অনেক বেশি বেতন দিয়ে থাকেন। তবুও এই দেশের সোনার টুকরো ছেলেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হওয়ার স্বপ্ন দেখে। তার কারণ একটিই, এখনো মনের গভীরে তারা বিশ্বাস করে এটি চাকরি নয় এটি একটি মহৎ জীবিকা, এটি একটি আদর্শের সংগ্রাম, নিজের সঙ্গে আত্মত্যাগের অঙ্গীকার। যে স্বপ্ন নিয়ে একজন শিক্ষক বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেয় সেখানে স্পষ্ট ভাষায় পড়ানোর কথা লেখা রয়েছে, গবেষণা করার কথা লেখা আছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের দৈনন্দিন কাজে সাহায্য করার কথা লেখা আছে, কিন্তু রং মেখে দলভুক্ত হওয়ার কথা কোথাও লেখা নেই। তাহলে এই পরিচয়টি কেন আমাদের সবচেয়ে প্রথম গ্রহণ করতে হবে?

বর্তমান ছাত্র রাজনীতির ক্ষতিকর দিক নিয়ে একবার আমি যখন খুব বড়ো বড়ো কথা বলছি তখন একজন ছাত্র আমাকে জিজ্ঞেস করলো, "স্যার, আমরা আমাদের রাজনীতি বন্ধ করলে আপনারা কি আপনাদের রাজনীতি বন্ধ করবেন?"

আমি ছাত্রটির প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিনি। একজন লাল শিক্ষক বা নীল শিক্ষক কি প্রশ্নটার উত্তর দেবেন?

—ভোরের কাগজ, ২২ অক্টোবর ১৯৯৭

টেলিভিশন বিক্রি হবে

আমি টেলিভিশন দেখি খুব কম। টেলিভিশন নিয়ে আমার নিজস্ব কিছু থিওরি রয়েছে। আমার ধারণা, টেলিভিশন বেশি দেখা হলে চারপাশের পৃথিবীটাকে পানসে এবং জলো বলে মনে হতে পারে। টেলিভিশনে মানুষের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দুটি ইন্দ্রিয়— চোখ এবং কানকে খুব কায়দা করে ব্যবহার করে মনোযোগকে ধরে রাখা হয়। কাজেই একবার চটকদার চকমকে টেলিভিশন প্রোগ্রাম দেখা অভ্যাস হয়ে গেলে নিজে থেকে কোথাও মনোযোগ দেওয়ার অভ্যাস চলে যেতে পারে। আমাদের চারপাশের যে পৃথিবী সেটি টেলিভিশনের প্রোগ্রামের মতো ঝকঝকে, রঙিন, উজ্জ্বল এবং চটকদার নয়। পাত্র-পাত্রীরা উচ্চস্বরে হাত-পা নেড়ে চোখ ঘুরিয়ে কথা বলে না, পিছন থেকে দৃশ্যানুযায়ী আবহ সঙ্গীত বাজে না, কাজেই টেলিভিশনের প্রোগ্রামের তুলনায় যদি এই পৃথিবীটাকে নেহায়েৎ উত্তেজনাহীন পানসে এবং একঘেয়ে মনে হয়, খুব বেশি দোষ দেওয়া যাবে না। আমি সেই ঝুঁকি নিতে চাই না বলে একেবারেই টেলিভিশন দেখতে চাই না।

ব্যাপারটি অবশ্য মোটেও কঠিন নয়। আমি যখন যুক্তরাষ্ট্রে ছিলাম তখন টেলিভিশনের চ্যানেলের সংখ্যা ছিল শতাধিক। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো রিমোট কন্ট্রোলের বোতাম টিপে টিপে আঙুল ব্যথা হয়ে গেলেও সত্যিকার অর্থে টেলিভিশনে দেখার মতো একটি অনুষ্ঠানও খুঁজে পাওয়া যেতো না। যদি টেলিভিশনের সামনে বসতাম খুব কম, সুইচ টিপেই যেহেতু চ্যানেল পাল্টে দেওয়া যেতো তাই বসে বসে সেটাই করতাম—টেলিভিশন দেখা থেকে অনেক বেশি হতো আঙুলের ব্যায়াম!

যুক্তরাষ্ট্র থাকাকালীন সময়ে কয়েক বছর পর হাতে কিছু অর্থ জমা হলে একবার দেশে বেড়াতে আসতাম। দীর্ঘদিন পরপর দেশে আসা হতো বলে দেশের সময়টাকে মনে হতো খুব মূল্যবান। আপনজনের কাছাকাছি বসে সময় কাটিয়ে দিতাম। টেলিভিশন খুলে বসে থাকার ইচ্ছে করতো না।

১৯৮৬ সালে দেশে বেড়াতে এসে খবর শোনার জন্য একবার টেলিভিশন খুলেছিলাম। তখন জেনারেল এরশাদ দোর্দণ্ড প্রতাপে রাজত্ব করছেন (আমার কেন জানি মনে হয় জেনারেলদের দেশ শাসনের মাঝে একটা রাজত্ব রাজত্ব ভাব থাকে)। টেলিভিশনে যিনি খবর পড়ছেন তিনি একটি দুটি কথা বলেই হঠাৎ করে মুখ বন্ধ করে ফেললেন এবং তার জায়গায় সেখানে জেনারেল এরশাদকে দেখা যেতে শুরু করলো, তিনি কোনো এক জায়গায় ভাষণ দিচ্ছেন। জেনারেল এরশাদকে বা তার বক্তব্য শুনে নয়, যে জিনিসটি দেখে আমি চমকে উঠলাম সেটি হচ্ছে তার ভাষা। তিনি এক ধরনের গ্রাম্য ভাষায় কথা বলছেন, "আমি আফনাদের লাইগ্যা গেরামের মাঝে ইস্কুল বানাইয়া দিছি, ব্রিজ বানাইয়া ফালাইছি........" এই রকম কথাবার্তা শুনে আমার গায়ের লোম দাঁড়িয়ে গেলো। একটি দেশের প্রেসিডেন্ট—তা তিনি যতো অন্যায়ভাবেই প্রেসিডেন্ট হয়ে থাকুন না কেন—শুদ্ধ বাংলায় কথা বলতে পারেন না এটা তো হতে পারে না। তিনি নিশ্চয়ই মোটামুটি চলনসই শুদ্ধ বাংলায় কথা বলতে পারেন, তাহলে তিনি এভাবে কথা বলছেন কেন? দেশের সাধারণ মানুষের সামনে কথা বলতে হলে কি 'কইরা ফালাইছি' 'বানাইয়া ফালাইছি' এই ভাষায় কথা বলতে হয়? ব্যাপারটি যে অসভ্যতা কিংবা অন্যায় কিংবা প্রতারণা মনে হতে পারে সেটা কি একবারও জেনারেল এরশাদের মনে হয়নি? আমি টেলিভিশনের কাছাকাছি বসে থাকা আমার ভাইবোন এবং পরিচিতদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম কিন্তু তারা ব্যাপারটিতে মোটাও গা করলো না। আমি কয়েকদিনের জন্য এসে এসব দেখে অবাক হচ্ছি, দেশে যারা আছে তারা এগুলো নিত্যদিন দেখছে, পীর-ফকির-নারী এইসব নিয়ে নানা ধরনের উৎকট রসিকতায় তারা অভ্যস্ত, তাদের কাছে এটি কোনো ব্যাপারই না।

বলা যেতে পারে সেবার আমি এক ধরনের শক পেয়ে আবার যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে গেলাম। পরের বার দেশে এসেছি '৯২ সালে। ততোদিনে এরশাদের পতন হয়েছে, নির্বাচন হয়েছে। আওয়ামী লীগ নিশ্চিত ছিল ইলেকশনে জিতে ক্ষমতায় যাবে, কিন্তু ক্ষমতায় এসেছে বিএনপি। এই ছয় বছরে টেলিভিশনের প্রতি আমার মমতা এতোটুকু বৃদ্ধি পায়নি। আমি দেশে ফিরে এসে টেলিভিশনের ধারে কাছে খুব একটা যাই না, কিন্তু একদিন কী মনে করে খবর শুনতে চাইলাম। সেদিন আমাদের ছাত্র জীবনের সমসাময়িক সাবেক ছাত্র নেতা শাহজাহান সিরাজ তার নিজের দল ত্যাগ করে বিএনপিতে যোগ দিচ্ছেন। আমি ছাত্র জীবনে তার

তেজস্বী বক্তৃতা, বঙ্গবন্ধুর প্রতি, তার দলের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসার কথা শুনে মুগ্ধ হয়েছি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তখন বড়ো বড়ো যে চারজন ছাত্র নেতা ছিলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের নিজস্ব ভাষায় যাদেরকে অনেক সময় 'চার খলিফা' ডাকা হতো তাদের একজন নিজ দল ত্যাগ করে অন্য দলে যোগ দিচ্ছেন, ব্যাপারটি নিঃসন্দেহে একটি জোরালো খবর, টেলিভিশনে সেটি খুব ফলাও করে প্রচার করা হলো। কিন্তু আমি হঠাৎ করে দেখলাম মোটামুটিভাবে পুরো টেলিভিশনটিই শাহজাহান সিরাজ সাহেবের হাতে ছেড়ে দেওয়া হলো। ছাত্রজীবনে তিনি ছিপছিপে ছিলেন, এখন এই বিশেষণটি আর ব্যবহার করা যাবে না, কিন্তু তিনি এখনো তেজস্বী ভাষায় বক্তৃতা দেন। তবে বক্তৃতার বিষয়বস্তুর পরিবর্তন হয়েছে। তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামে তার 'একক' কৃতিত্বের বিশদ বর্ণনা দিলেন, আওয়ামী লীগ এবং বঙ্গবন্ধুরা দেশের কী রকম সর্বনাশ করেছে সেটি নিখুঁতভাবে উপস্থাপন করলেন। দলত্যাগ করে সরকারি দলে যোগ দেওয়ার জন্য কৃতজ্ঞতাবশত টেলিভিশনের খবরের সিংহভাগটি শাহজাহান সিরাজ সাহেবকে ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য দেওয়া হলো এবং তিনি সেটি পুরোপুরি সদ্ব্যবহার করলেন।

আমি মোটামুটি হতবাক হয়ে টেলিভিশনের দিকে তাকিয়ে রইলাম। দলত্যাগী রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের কথা গুরুত্ব দিয়ে নেওয়া ঠিক নয় বলে আমি তার বক্তব্যে কোনো গুরুত্ব দিতে পারছিলাম না, কিন্তু যদি গুরুত্ব দেওয়া সম্ভবও হতো তবু এটি খবরে স্থান পাওয়ার কথা নয়। 'খবর' কথাটির একটি বিশেষ অর্থ রয়েছে—সেখানে কী ঘটেছে সেটি বলা হবে, একজন অন্যজন সম্পর্কে কী মনে করে সেটি তার নিজের মুখে এতো দীর্ঘ সময় নিয়ে বলা হবে না।

আমার কাছাকাছি যারা টেলিভিশনের সামনে বসেছিল আমি তাদেরকে ব্যাপারটি নিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, তারা আমার কথার কোনো গুরুত্ব দিলো না। হাই তুলে বললো, "দেশের খবর শুনতে চাইলে শর্ট ওয়েভ রেডিও দিয়ে বিবিসি শুনো। টেলিভিশনের সামনে বসেছো কেন?"

"তাহলে টেলিভিশনে কী দেখাবে?"

"প্রথমে খালেদা জিয়াকে তারপর অন্য মন্ত্রীদের। এতোগুলো মন্ত্রী রয়েছে তাদের সবাইকে দেখাতে দেখাতে সময় চলে যায় না? মাত্র আধা ঘণ্টা সময়!"

আমি সেবার নতুন একটি তথ্য নিয়ে আবার যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে গেছি, দেশের মানুষ দেশের খবর শোনে বিবিসিতে—টেলিভিশনটি রয়েছে মন্ত্রীদের দেখানোর জন্য।

এর প্রায় চার বছর পর আমি পাকাপাকিভাবে দেশে ফিরে এসেছি। দীর্ঘদিন পাশ্চাত্য দেশে থাকার জন্য আমার জীবনধারার পরিবর্তন হয়েছে। দেশে এসে আবিষ্কার করলাম নানা ধরনের গ্যাজেট ঘরে স্থান করে নিয়েছে—কফি খাবার জন্য কফি মেশিন, গান শোনার জন্য সাউন্ড সিস্টেম, রান্না করার জন্যে মাইক্রো ওয়েভ ওভেন, একাধিক কম্পিউটার ইত্যাদি ইত্যাদি। তবে অনেক ভাবনা-চিন্তা করে ঘরে যে জিনিসটির স্থান দেওয়া হলো না সেটি হচ্ছে একটি টেলিভিশন।

আমি এবং আমার পরিবারের কেউই সেই টেলিভিশনের অভাব অনুভব করলাম না। খবরের কাগজে দেশের খবর পাওয়া যায়, শর্ট ওয়েভ রেডিওতে বাইরের খবর। সন্ধ্যেবেলা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজকর্ম, পড়াশোনা, লেখালেখিতে সময় কেটে যায়। কোনো কিছু করার না থাকলে বই নিয়ে বসি, নিচু গলায় রবীন্দ্র সঙ্গীত শুনতে শুনতে প্রিয় একটা বই নিয়ে আধশোয়া হয়ে থাকার মতো আনন্দ আর কিসে আছে? মাঝে মাঝে টেলিভিশনে অগ্রজ হুমায়ূন আহমেদের নাটক হয়, তখন বন্ধুবান্ধবের বাসায় গিয়ে সেই নাটক দেখি। বন্ধুবান্ধব সবাই চমৎকার ভদ্রলোক কেউ এতোটুকু বিরক্ত হয় না।

এভাবে বেশ চলে যাচ্ছিল। পরিচিত বন্ধুবান্ধব শেষ পর্যন্ত বিশ্বাস করেছে আমি আসলেই টেলিভিশন ছাড়া বেঁচে থাকতে পারি। ঠিক তখন হঠাৎ একটি ব্যাপার ঘটলো। ১২ জুনের নির্বাচনে ক্ষমতা বদল হলো, সরকার গঠন করলো আওয়ামী লীগ। আমি খবর পেলাম, একুশ বছর পর প্রথমবার টেলিভিশনে বঙ্গবন্ধুকে দেখানো হয়েছে। বিএনপি সরকারের বঙ্গবন্ধুকে টেলিভিশন থেকে নির্বাসন দেওয়ার অত্যন্ত অন্যায় সিদ্ধান্তের জন্য বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত অনেক ব্যাপার, মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি, স্বাধীনতার ইতিহাসও টেলিভিশনে পুরোপুরি অনুপস্থিত ছিল। নতুন সরকার গঠন করার পর বাঁধভাঙা বন্যার মতো সেগুলো টেলিভিশনে আসতে শুরু করেছে। আওয়ামী লীগের কাছে বঙ্গবন্ধু একটি রাজনৈতিক ব্যাপার, তাঁকে ব্যবহার করে রাজনৈতিকভাবে লাভ হয় বলে নানাভাবে টানাহেঁচড়া করে নানা সাইনবোর্ডে বসিয়ে তাকে নানাভাবে অপমান করা হয়েছে। 'জয় বাংলা' 'জয় বঙ্গবন্ধু' বলে স্লোগান দিয়ে ধারালো অস্ত্র হাতে

প্রতিপক্ষকে আক্রমণ করার ঘটনার কথা আমি নিজে বলতে পারবো। আমাদের মতো মানুষের কাছে বঙ্গবন্ধু রাজনৈতিক খুঁটি নন, এই মানুষটির জন্য আমাদের বুকে সত্যিকারের ভালোবাসা রয়েছে। '৭২ থেকে '৭৫ সাল পর্যন্ত আওয়ামী লীগের শাসনকালের অসংখ্য ভয়াবহ ত্রুটিগুলোর কথা আমরা শুধুমাত্র বঙ্গবন্ধুর প্রতি গভীর ভালোবাসার কারণে ক্ষমা করে দিতে রাজি আছি।

একুশ বছর পর এই মানুষটিকে, তার সঙ্গে সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধের নানা স্মৃতি, স্বাধীনতাবিরোধীদের নানা দুষ্কর্মের ইতিহাস টেলিভিশনে দেখানো শুরু হলো এবং হঠাৎ করে এই প্রথমবার আমি নিজের বাসায় একটি টেলিভিশনের অভাব অনুভব করতে লাগলাম। আমি তখনো বন্ধুবান্ধবের বাসায় বসে টেলিভিশন দেখে কাজ চালিয়ে নিচ্ছিলাম কিন্তু হঠাৎ করে সরকারের একটি ঘোষণায় আমি দুর্বল হয়ে পড়লাম। শুনতে পেলাম নতুন সরকার কথা দিয়েছে, এখন থেকে টেলিভিশনকে সরকারের স্তব গাওয়ার জন্য ব্যবহার করা হবে না, এটি হবে নিরপেক্ষ এবং বস্তুনিষ্ঠ। শুধু তাই নয়, খবর পেলাম সত্যি সত্যিই টেলিভিশনে তার একটি দুটি প্রমাণ পাওয়া গেছে।

আমি তখন একটি টেলিভিশন কেনার সিদ্ধান্ত নিলাম। আমার পরিচিত বন্ধুবান্ধব গাড়ি ভাড়া করে আমার সেই টেলিভিশন কিনে এনে আমাদের বাসায় বসিয়ে দিয়ে গেলো।

তারপর আরো বছরখানেক কেটে গেছে। এর মাঝেই টেলিভিশন নিয়ে যেসব অঙ্গীকার করা হয়েছিল তার সব মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয়েছে। টেলিভিশনের খবরের পুরো ব্যাপারটি এখন আবার মন্ত্রীদের চেহারা দেখানোর একটি নাটকে পরিণত হয়েছে। কিছু কিছু মন্ত্রীকে এতো ঘন ঘন দেখতে হয় যে, আমি নিশ্চিত, তারা কবে চুল কেটেছেন, কবে একটি নতুন টাই কিনেছেন, সেটিও টেলিভিশনের নিয়মিত দর্শকেরা বলে দিতে পারবেন।

ইদানীং যারা টেলিভিশনে খবর শুনছেন তারা সেখানে কী শুনবেন তা আগে থেকে বলে দিয়ে তাদের অনেক সময় বাঁচিয়ে দিতে পারি। প্রথমেই থাকবে প্রধানমন্ত্রীর কোনো একটি বক্তব্য, সেই বক্তব্যে থাকবে তিনি দেশ নিয়ে কী স্বপ্ন দেখছেন তার বর্ণনা। 'প্রধানমন্ত্রী বলেছেন' 'প্রধানমন্ত্রী আরো বলেছেন' এই ব্যাপারগুলো শেষ হওয়ার পর অন্য মন্ত্রীদের দেখানো শুরু হয়, কোনো কোনো সময় ব্যাপারগুলো রীতিমতো কুরুচিপূর্ণ। বন্যায় জনপদ ভেসে গিয়েছে, সেখানে একজন মন্ত্রীর স্পীডবোটের নিরাপদ আশ্রয়ে ঘুরে বেড়ানো কিংবা ব্রিজের ওপর

ট্রেজারা পড়ে মানুষ মারা গিয়েছে এবং মন্ত্রীরা হেলিকপ্টারে করে সেই দৃশ্য দেখছেন, এই ব্যাপারগুলো যে হৃদয়হীন ঘটনা সেটি কী মন্ত্রী মহোদয় বা টেলিভিশনের কর্মকর্তারা জানেন না? মন্ত্রীদের দেখানো শেষ হওয়ার পর মন্ত্রীদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন সভা-সমিতি-সেমিনারগুলো দেখানো শুরু হয়। সেখানে মন্ত্রী এবং 'আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য' ছাড়াও আমাদের কিছু পরিচিত বুদ্ধিজীবীদের দেখা যায়। তারা সবাই সেখানে নিঃশব্দে ঠোঁট নেড়ে বক্তৃতা দেন এবং দর্শকরা শক্ত কাঠ হয়ে বসে থাকেন। সেমিনার দেখানো শেষ হওয়ার পর 'বর্ণাঢ্য র‍্যালি'গুলো দেখানো হয়, রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে আসা বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে দেখানো হয়। এর মাঝে সময় শেষ হয়ে আসার কারণে কয়েক মিনিট সিএনএন থেকে কেটে আনা একটি-দুটি দৃশ্য দেখাতে দেখাতেই স্টক মার্কেট দেখানোর সময় চলে আসে। এরপর খেলাধুলার একটু খবর এবং দেশের কোন বিভাগে কতো তাপমাত্রা ছিল সেটা দেখিয়েই খবর শেষ করে দেওয়া হয়।

বাংলাদেশ টেলিভিশনের খবর দেখলে মনে হবে, বাংলাদেশের মতো একঘেয়ে বৈচিত্র্যহীন দেশ সারা পৃথিবীতে একটিও নেই। অথচ ভোরবেলা খবরের কাগজ হাতে নিয়ে দেখা যাবে ব্যাপারটি সম্পূর্ণ অন্যরকম, দেশে খবর তৈরি হচ্ছে, খবর ঘটছে। একেকটি খবরের কাগজের হেড লাইন একেক রকম, কয়েকটা খবরের কাগজ একত্র করে খবরগুলো একত্র করা হলেই মোটামুটি দেশের অবস্থাটা বোঝা যায়। এই জিনিসগুলো আমরা টেলিভিশনে শুনতে চাই, কিন্তু শুনতে পাই না।

আমি মোটামুটিভাবে বাংলাদেশ টেলিভিশন দেখা ছেড়ে দিয়েছি, তবু সেপ্টেম্বরের তিরিশ তারিখে টেলিভিশনের সামনে বসেছিলাম। সেদিন এককালীন সহপাঠী খ. ম. হারুনের প্রযোজিত এবং সাহসী সাংবাদিক আবেদ খানের উপস্থাপিত 'ঘটনার আড়ালে' অনুষ্ঠানটিতে ছাত্র রাজনীতি নিয়ে আলোচনা হবে। আমাদের সর্বজনশ্রদ্ধেয় রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ ছাত্র রাজনীতি নিয়ে কয়েকটি সত্য ভাষণ করার পর আমি আশা করেছিলাম স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা তাদের পক্ষ থেকে কিছু কথা বলবেন, কিন্তু তাদের নীরবতাটুকু ভীতিপ্রদ। শ্রদ্ধেয় আবেদ খান তার অনুষ্ঠানে আমাকে ছাত্র রাজনীতি সম্পর্কে কিছু বলতে বলেছিলেন। (আমাদের আদি নিবাস বৃহত্তর ময়মনসিংহের নেত্রকোনা অঞ্চল বলে উচ্চারণে কিছু সমস্যা রয়েছে, খুব সতর্ক

না থাকলে আমরা 'পোকা'কে 'পুকা' বলে ফেলি। তাই জনসমক্ষে সাধারণত কিছু বলতে চাই না।) ছাত্র রাজনীতির বর্তমান রূপটি আমাদের পড়াশোনার ব্যাপারে এতো সমস্যা করছে যে আমি সেটি নিয়ে যেখানেই সুযোগ পাই কিছু-একটা বলতে প্রস্তুত। 'ঘটনার আড়ালে' অনুষ্ঠানে আবেদ খান আমাকে 'ছাত্র রাজনীতি' নিয়ে খোলামেলাভাবে প্রশ্ন করলেন, আমিও খোলামেলাভাবে তার প্রশ্নের উত্তর দিলাম।

নির্দিষ্ট সময়ে অনুষ্ঠানটি দেখে অবশ্যি আমার খুব আশাভঙ্গ হলো। আমি যে কথাগুলো বলেছি সেগুলো কেটেছেঁটে বিভিন্ন অংশ থেকে জোড়াতালি দিয়ে সরকারি প্রেসনোটের মতো একটি বক্তব্য অনুষ্ঠানে প্রচারিত হয়েছে। প্রযোজক খ. ম. হারুন এবং সাংবাদিক আবেদ খান দুজনেই খুব সাহসী, তারা ভয় পাওয়ার মানুষ নন—টেলিভিশন কর্তৃপক্ষ নিশ্চয়ই 'সকল কথা সকলের বলা উচিত না এবং বলা হলেও শোনা উচিত না' এই নীতিতে বিশ্বাসী। 'ঘটনার আড়ালে' অনুষ্ঠানটিরও যে একটি 'ঘটনার আড়ালে' রয়েছে সেটি কে জানতো?

তবে ৩০ সেপ্টেম্বর টেলিভিশনের সামনে বসে থেকে আমি যে বিষয়টি দেখে সত্যিকারভাবে আতঙ্কগ্রস্ত হয়েছি সেটি সেদিনের রাত ৮টার খবর। তখন রাজপথে জনসভা করা নিয়ে সরকারি এবং বিরোধী দলের সুপরিকল্পিত ঝগড়াটি ঠিক যেভাবে শুরু হওয়ার কথা সেভাবে শুরু হয়েছে। রাজপথে জনসভা না করেই অনেক বড়ো জনসভা করা সম্ভব সেটি দেখানোর জন্য পল্টনে বিশাল জনসভা হয়েছে, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সেই জনসভায় বক্তৃতা দিয়েছেন। আটটার খবরে সেই তথ্যটি প্রচার করে বাংলাদেশ টেলিভিশন এক পর্যায়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভাষণটি প্রচার করতে শুরু করলো।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অত্যন্ত চমৎকার ভাষণ দেন, আমি দীর্ঘদিন দেশের বাইরে ছিলাম বলে তার স্বকণ্ঠে ভাষণ শুনিনি। এক বইমেলায় আমি প্রায় জোর করে নিজেকে আমন্ত্রিত করিয়ে তার ভাষণ শুনেছি, মুগ্ধ হয়ে লক্ষ্য করেছি তিনি খোলামেলাভাবে কিছু গুছিয়ে কথা বলেন, কথা বলার ভঙ্গিতে এক ধরনের আন্তরিকতা রয়েছে, কথাগুলো বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে। তারপরেও আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, খবরে 'ভাষণ দেওয়া হয়েছে' এই তথ্যটি পরিবেশন করার কথা, 'ভাষণটি' প্রচার করার কথা নয়। যদি প্রচার করা হয় তার একটিমাত্র অর্থ—উচ্চ পর্যায় থেকে এ সম্পর্কে নির্দেশ রয়েছে। মোটামুটিভাবে ধরে নেওয়া যেতে পারে বাংলাদেশ টেলিভিশনটি এখন থেকে দেশের মানুষের

প্রয়োজনীয় তথ্য দেওয়ার জন্য নয়, সরকারের 'প্রোপাগান্ডা মেশিন' হিসেবে কাজ করার জন্য প্রস্তুতি নিয়েছে। দেশের কয়েক কোটি মানুষ টেলিভিশন দেখে, তাদেরকে নিজেদের পছন্দমতো তথ্য পরিবেশন করার এর থেকে শক্তিশালী মাধ্যম আর কোথায় পাওয়া যাবে? এই অমূল্য সুযোগ নেবে না এরকম 'নির্বোধ' কে রয়েছে?

টেলিভিশনের খবর শুনে মনে হয় দেশের সর্বনাশা ঘূর্ণিঝড়টি খবর নয়—ঘূর্ণিঝড়ের সময় প্রধানমন্ত্রী কী বলেছেন এবং কী করেছেন সেটি হচ্ছে খবর। মানুষের দুঃখ-কষ্ট এবং যন্ত্রণাটি খবর নয়, দুঃখী মানুষের হাতে মন্ত্রীরা রিলিফ তুলে দিচ্ছেন—সেটি খবর। ভয়ঙ্কর ট্রেন দুর্ঘটনা এবং সেই দুর্ঘটনায় মানুষের মৃত্যুটি খবর নয়, দুর্ঘটনায় মন্ত্রীদের উদ্বেগটুকু খবর—শোক বাণীটি খবর। দেশের একটি বড়ো ঘটনা বা একটি বড়ো বিপর্যয়ের আলাদাভাবে আর কোনো মূল্য নেই। এই মূল্যটি অর্জন করতে হয় একটি মন্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক করে। কোনো কিছু আর খবর নয়—সবই 'কভারেজ।'

এই যদি সত্যি হয় তাহলে আমাদের মিথ্যে কেন আশা দেওয়া হয়েছিল? ঘরের কোণায় ফেলে রাখা বিশাল একটি টেলিভিশন দেখে এখন যদি নিজেকে প্রতারিত মনে হয়, সেটা কী খুব অযৌক্তিক ব্যাপার?

আমি যদি এখন আমার টেলিভিশনটি বিক্রি করতে চাই, সেটি কী খুব অন্যায় হবে?

—ভোরের কাগজ, ৯ নভেম্বর ১৯৯৭।

আমরা আন্দামানবাসী

ব্রিটিশ আমলে যারা ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে খুব কঠিনভাবে আন্দোলন করতো তাদের শাস্তি দেওয়ার জন্য আন্দামানে দ্বীপান্তর দেওয়া হতো। শব্দটা ব্যবহৃত হতো 'কালাপানি' এবং আন্দামানে কালাপানি হয়েছে শুনলেই কেমন যেন গা ছমছম করতে শুরু করতো। ছেলেবেলায় আন্দামানে বন্দিদের সেই দুঃসহ যন্ত্রণার কথা পড়ে মস্তিষ্কের মাঝে সেই আন্দামান দ্বীপের একটা ছবি আঁকা হয়ে গিয়েছিল। আন্দামান শুনলেই মনে হতো ভয়ঙ্কর পশ্চাৎপদ জনবিচ্ছিন্ন আদিবাসী মানুষের এলাকা, বনজঙ্গল পোকামাকড় আর অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, আধুনিক জগতের সঙ্গে সমস্ত রকম সম্পর্কহীন, ভালোবাসাহীন, নির্দয় একটা জগৎ। এতোদিনে আন্দামানের নিশ্চয়ই অনেক উন্নতি হয়েছে, খোঁজখবর রাখি না বলে বলতে পারি না—হয়তো এখন ঘরে ঘরে ইলেকট্রিসিটি, কালার টেলিভিশন, মোড়ে মোড়ে ডিশ অ্যান্টেনা এবং নিয়ন আলোতে ঝলমল টুথপেস্টের বিজ্ঞাপন। তবুও ঠিক কি কারণ জানি না আন্দামান কথাটা মনে হলেই এখনো আমার চোখের সামনে সেই ভয়ঙ্কর পশ্চাৎপদ পৃথিবীর সঙ্গে সম্পর্কহীন কুসংস্কার আর রোগশোকে ঢাকা অস্বাস্থ্যকর একটা এলাকার ছবি ভেসে ওঠে।

আন্দামান ভারতবর্ষের একটি দ্বীপ, এ দেশের দৈনন্দিন খবরাখবরে তার নাম একেবারেই আসে না। কিন্তু গত কিছুদিন ঢাকা শহরে এসে এবং শহরের বাইরে গিয়ে হঠাৎ করে আমার কেন জানি মনে হয়েছে বাংলাদেশকে মোটামুটি দুই ভাগে ভাগ করা যায়। এক ভাগ হচ্ছে ঢাকা শহর, অন্য ভাগ হচ্ছে বাংলাদেশের বাকি অংশ যেটাকে মোটামুটিভাবে আন্দামান বলা যায়।

একটু উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে। আমি সিলেট শহরে থাকি, কয়েক মাস আগে একদিন দক্ষিণ দিকে তাকিয়ে দেখি—দূরে কোথায় জানি দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। খোঁজখবর নিয়ে জানতে পারলাম শ্রীমঙ্গলের কাছাকাছি মাগুড়ছড়া নামক জায়গায় গ্যাস কূপে আগুন ধরেছে। রান্নাঘরের গ্যাসের আগুন

স্নিগ্ধ নীল রঙের হয়ে থাকে। এই গ্যাসের আগুন টকটকে লাল। বহু দূরে শ্রীমঙ্গল এলাকার আগুন যদি সিলেট শহর থেকে এতো স্পষ্ট দেখা যায় এই আগুনের আকার-আকৃতি নিশ্চয়ই ভয়ঙ্কর। টেলিভিশনে সেই রাতে খবরটা গোপন রাখা হলো। (কারণটি কি কে জানে। অক্সিডেন্টালের সঙ্গে কি সরকারের কোনো ধরনের কুটুম্বিতা আছে?) পরদিন খবরের কাগজে আগুনের খবর পেলাম, অন্য নানা ক্ষয়ক্ষতির খবরের সঙ্গে যে খবরটি শুনে আমাদের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়লো সেটি হচ্ছে যে, সিলেটের সঙ্গে সমস্ত ট্রেন যোগাযোগ বন্ধ হয়ে গেছে। কিছুদিন পর যখন ঢাকা যেতে হলো বাধ্য হয়ে সবাইকে নিয়ে বাসে রওয়ানা দিলাম। খোয়াই নদীর কাছাকাছি এসে দেখি প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছে, খরস্রোতা নদী নড়বড়ে ব্রীজটিকে প্রায় ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। পুলিশ ব্রিজের সামনে দাঁড়িয়ে আছে, দুই পাশে গাড়ি-বাস-ট্রাক দাঁড় করিয়ে রাখা। পুলিশের সঙ্গে খানিকক্ষণ অনুনয়-বিনয় করার পর বাসকে সেই নড়বড়ে ব্রিজের ওপর দিয়ে যেতে দেওয়া হলো, আমরা ব্রীজ পার হয়ে শেষ পর্যন্ত ঢাকা এসে পৌঁছলাম। ঢাকায় এসেই খবর পেলাম আমাদের বাসটি পার হওয়ার পরই খোয়াই নদীর ব্রীজ পানিতে ভেসে গেছে। সিলেট শহরে ট্রেন যোগাযোগ ছিল না—এখন সড়ক যোগাযোগও বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলো।

সাধারণ মানুষের দুর্গতির কোনো সীমা রইলো না। অবশ্য এই ব্যাপারটি এ দেশে কখনই কারো বিবেচ্য বিষয় নয়—বরং মাঝে মাঝে মনে হয় ভাগ্যিস এই দেশে সাধারণ মানুষেরা আছে, না হলে রাজনৈতিক দলগুলো কাদের ওপর অত্যাচার করে নিপীড়ন করে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করতো? সিলেট শহরের রেল এবং সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার পরও অবশ্য বড়ো বড়ো মন্ত্রী-স্পিকার মহোদয়, সাংসদ, কর্মকর্তাদের সিলেটে যেতে কোনো অসুবিধা হচ্ছিল না। কারণ আকাশে যেহেতু ভেঙে যাওয়ার কিছু নেই প্লেনের ফ্লাইট নিয়মিতভাবে চলছে। সিলেট শহরে দিনে তিনটা ফ্লাইট, যারা হাজার দুয়েক টাকা খরচ করতে পারেন তারা দিনে দিনে সিলেট থেকে ঢাকা এসে ঘুরে যেতে পারেন। সাধারণ মানুষের দুর্গতি হলে কেউ মাথা ঘামায় না' এবং বড়ো মানুষদের দৈনন্দিন জীবনের কোনো অসুবিধা হচ্ছে না, কাজেই আমার ধারণা, সিলেট শহর যে পুরো দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে সেটি বেশ কয়েকদিন কেউ জানতেও পারলো না। শেষ পর্যন্ত যখন সরকারের টনক নড়লো তখন যতোদূর মনে পড়ে তাড়াহুড়ো করে সেনাবাহিনীকে আদেশ দেওয়া হলো ভাসমান একটা ব্রীজ তৈরি করার জন্য। আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম, কারণ

আমি জানি যুদ্ধবিগ্রহের সময় সেনাবাহিনীর লোকজন কয়েক ঘণ্টায় নদীর ওপর ব্রীজ তৈরি করে ফেলে, তার ওপর দিয়ে সাঁজোয়া বাহিনী ট্যাংক বহর পার করে নিয়ে যায়। আমি নিশ্চিত ছিলাম সিলেট শহরের সঙ্গে সড়ক যোগাযোগ হতে এখন নিশ্চয়ই মাত্র কয়েক ঘণ্টা বাকি।

কিন্তু মজার ব্যাপার হলো, তারপরও বেশ কয়েক সপ্তাহ কেটে গেলো সেই ব্রীজ খাড়া হলো না। আমাদের বাজেটের খুব বড়ো একটা অংশ সেনাবাহিনীকে দেওয়া হয়, আমার ধারণা সেই টাকা ঠিক করে খরচ করা হয় না কিংবা কে জানে সেনাবাহিনীর ইঞ্জিনিয়াররা হয়তো এখনো শর্টকোর্সে পড়াশোনা করেন, নদীর ওপর দিয়ে কিভাবে দ্রুত ব্রীজ তৈরি করতে হয় সেটা তাদের সিলেবাসে নেই। কিংবা কে জানে ইঞ্জিনিয়ারদের হয়তো বিলেত-আমেরিকা থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে আনা হয়েছে তারা বরফ-তুষারের ওপর ব্রীজ তৈরি করতে পারেন, বাংলাদেশের নদীনালার ওপর ব্রীজ তৈরি করতে শেখেননি। তবে তাদের কপাল ভালো যে, তারা আমার ছাত্র নন, হলে কিছুতেই আমার কাছ থেকে তারা পাস মার্ক পেতেন না।

কাজেই খোয়াই নদীর ওপর ব্রীজ তৈরি হতে বহুদিন লেগে গেলো। শেষ পর্যন্ত যখন ব্রীজ তৈরি হলো তখন সেই নড়বড়ে ব্রীজ দিয়ে যাতায়াতও হলো খুব সীমিত, হালকা গাড়ি ছাড়া আর কিছু যেতে পারে না। শুধু তাই নয়, ব্রীজের উপর কড়া মিলিটারি পাহারা, তারা গাড়ির আরোহীদের দিকে চোখ কটমট করে তাকিয়ে থাকেন। '৭১-এ পাকিস্তানি মিলিটারির নৃশংসতা দেখে এই সম্প্রদায়ের ওপরই কেমন জানি ভয় ঢুকে গেছে, এতোদিন পর নিজের দেশের মিলিটারি জানার পরও তাদের দৃষ্টি দেখলেই হাত-পা কেমন জানি শরীরের ভিতর সেঁধিয়ে যায়।

সিলেটের লোকজনের অসীম ধৈর্য—তারা এই পুরো সময়টুকু ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করলো। জিনিসপত্রের অগ্নিমূল্য এক সময় তাদের গা-সওয়া হয়ে গেলো, দেশ থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকাটাই এক সময় তাদের স্বাভাবিক মনে হতে থাকে।

এ রকম অবস্থাতেও মাঝে মাঝে আমার ঢাকা আসতে হয়, বাসে ওঠার আগে সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আসি। সিলেট-ঢাকা রাস্তা অতিশয় মনোরম। তবে একটু পরপর যখন দেখতে পাই খাদে বাস, ট্রাক এবং মাইক্রোবাস উল্টো হয়ে পড়ে আছে তখন দ্রুত চোখ ফিরিয়ে নিই। ধীরে ধীরে

আমার নার্ভ শক্ত হয়ে আসছে—মনে হয় কিছুদিনেই সেগুলোও সহ্য করতে পারবো। যে জিনিসটিতে এখনো অভ্যস্ত হতে পারছি না সেটি হচ্ছে হিন্দি গান। বাস আছে এবং হিন্দি গান নেই সেটি কি কেউ কখনো দেখেছে?

এ রকম একটা পরিস্থিতি দেখে আমার যদি মনে হয় বাংলাদেশে নয় আন্দামানে আছি সেটা কি খুব ভুল হবে?

প্রায় দুই যুগ আমি যে বাংলাদেশকে দেখেছিলাম এখন নিঃসন্দেহে আমরা অর্থনীতিতে তার থেকে অনেক এগিয়ে এসেছি, আশপাশে তাকালে খবরের কাগজে চোখ বুলালে, রেডিও টেলিভিশন শুনতে এমন কি বিদেশে গেলেও সেটা টের পাওয়া যায়। শুধু অর্থনীতি বা দেশের শিল্প এবং প্রযুক্তিতে নয় আমাদের সংস্কৃতির জগতেও একটা ছোটখাটো বিস্ফোরণ ঘটছে—সবই যে ভালো তা বলবো না, কিন্তু কিছু একটা যে ঘটছে তাতে সন্দেহ নেই। খবরের কাগজ খুললেই দেখতে পাই চিত্র প্রদর্শনী হচ্ছে, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে দেশ-বিদেশের শিল্পীরা গান গাইছেন, চমৎকার সব নাটক হচ্ছে, বিদেশী চলচ্চিত্র প্রদর্শনীতে লোকজন ভিড় করে অপূর্ব সব ছবি দেখছেন, কম্পিউটারের মেলায় সর্বশেষ প্রযুক্তি সবাই উৎসাহ নিয়ে দেখছেন—খেলাধুলার কথা তো ছেড়েই দিলাম। পকেটে কিছু অর্থ, সংস্কৃতি মহলে কিছু যোগাযোগ এবং যানজটে আটকে থাকার সময় দূষিত বায়ু সহ্য করার মতো শক্ত একটা ফুসফুস থাকলেই একজন চমৎকার কিছু একটা উপভোগ করতে যেতে পারে। সংস্কৃতিবান হওয়ার প্রথম সিঁড়িটি অতিক্রম করা আজকাল কিছুই কঠিন নয়।

তবে যে ব্যাপারটি লক্ষণীয়, সেটি হচ্ছে সাহিত্য-শিল্প-সংস্কৃতি বা ক্রীড়ার চমৎকার এই সমন্বয়টি পুরোপুরি ঢাকাকেন্দ্রিক। ঢাকার বাইরে কখনো কোনো সত্যিকারের চিত্র প্রদর্শনী হয় না, বড়ো বা খ্যাতিমান শিল্পীদের সঙ্গীতানুষ্ঠান হয় না, নাটক বা ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল হয় না, কম্পিউটার বা বিজ্ঞানমেলা হয় না। শুধু যে হয় না তাই নয়, সবাই ধরে নিয়েছেন যে, এটি হওয়ারও কথা নয়।

যারা দেশকে চালান তারা সবাই ঢাকায় থাকেন, দেশের শিল্পী-সাহিত্যিক গুণীজনরাও ঢাকায় থাকেন, আমি পুরোপুরি নিশ্চিত নই কিন্তু মোটামুটি নিশ্চিত যে, দেশের সবচেয়ে বড়ো চোরাচালানি, সন্ত্রাসী, খুনি-বদমাশরাও নিশ্চয়ই ঢাকায় থাকে। আমরা রেডিও টেলিভিশন দেখে, খবরের কাগজ পড়ে, বুদ্ধিজীবীদের বিবৃতি শুনে মোটামুটিভাবে ধরে নিয়েছি বাংলাদেশ

কথাটির প্রকৃত অর্থ হচ্ছে ঢাকা। যখন আমরা বলি দেশ গড়তে হবে, আমরা আসলে বোঝাই ঢাকাকে গড়তে হবে। যখন বলি দেশের যানজট সমস্যা দূর করতে হবে, তখন আসলে আমরা ঢাকা শহরের যানজট দূর করার চিন্তাভাবনা করি। যখন বলি দেশকে শিল্প-সাহিত্যে উন্নত করতে হবে, তখন আসলে আমরা ঢাকা শহরে আরো কিছু ভালো লাইব্রেরি, সুন্দর কিছু মিলনায়তন তৈরি করে দেশ-বিদেশের কবি-সাহিত্যিক-শিল্পীকে নিয়ে আসার কথা চিন্তা করি। যখন বলি দেশে ভালো স্কুল নেই, প্রকৃতপক্ষে আমরা বোঝাই ঢাকা শহরে ভালো স্কুল নেই। ব্যাপারটি বিশেষ করে চোখে পড়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্জুরি কমিশনের এক সেমিনারে, যেখানে বক্তাগণ (অবশ্যই প্রায় সবাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের) দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ব্যবস্থার কথা আলোচনা করতে গিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাব্যবস্থার সমস্যার কথা আলোচনা করলেন এবং আমি অবাক হয়ে আবিষ্কার করলাম তাদের কেউই জানেন না যে, তারা যে সমস্ত সমস্যার কথা নিয়ে আলোচনা করেছেন তার প্রায় সবগুলোই অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো-না-কোনভাবে সমাধান করা হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে কাউকে বলার সুযোগ দেওয়া হলো না বলে চমৎকার সব সমাধানের কথা না শুনে সেমিনারে শুধু পুরোনো সব সমস্যার কথা শুনতে হলো।

কথা হচ্ছে এই ব্যাপারটিকে কি মেনে নেওয়া যায় না? আমরা সবাই জানি সব যুগেই সব দেশেই সংস্কৃতি-শিল্প-সাহিত্যের একটা কেন্দ্রবিন্দু থাকে। আমাদের দেশের বেলায় সেটি হচ্ছে ঢাকা শহর, এখানে বিনোদনের জন্য রয়েছে চিত্র প্রদর্শনী, নাটক, থিয়েটার, চলচ্চিত্র, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বা খেলাধুলা। যারা ঢাকার বাইরে থাকেন তাদের একমাত্র বিনোদন হচ্ছে বাংলাদেশ টেলিভিশনের প্যাকেজ নাটক। যারা বাড়ির ছাদে ডিশ অ্যান্টেনা লাগিয়েছেন তাদের জন্য হিন্দি সিনেমা। এই সহজ সত্যটি মেনে নিতে সমস্যা কি?

একটি খুব বড়ো সমস্যা রয়েছে যার গুরুত্বটি সবাই ধরতে পারে না। ঢাকা শহরের কালচারকে দিয়ে দেশকে বিচার করলে খুব বড়ো ভুল করা হবে। দেশের প্রগতিশীল মানুষেরা যে রকম দেশকে সামনের দিকে নিয়ে যাচ্ছেন ঠিক সে রকম মৌলবাদী ধর্মান্ধ মানুষেরা দেশকে পিছনে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। কেউ বিশ্বাস করবে কি-না জানি না, আমার সন্তানদের এমন একটি স্কুল থেকে ছাড়িয়ে আনতে হয়েছে যেখানে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বীরপুরুষ কবিতাটি পড়ানো হয় না, ধর্ম

শেখানোর নামে সাম্প্রদায়িকতা শেখানো হয়, ক্লাসে বোঝানো হয় মুসলমান ছাড়া আর কেউ বেহেশতে যাবে না। কবি শামসুর রাহমানকে সিলেট শহরে আসতে দেওয়া হয়নি। শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিসৌধ তৈরি করা হবে খবরটি প্রকাশ পাওয়ার পর থেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রগতিশীল শিক্ষকদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার শুরু হয়ে গেছে।

কেউ যদি মনে করে এই ধর্মান্ধ মৌলবাদীরাই একমাত্র শক্তি সেটা একেবারেই সত্য নয়। এদের বিরুদ্ধে রয়েছে বিশাল প্রগতিশীল জনগোষ্ঠী। স্বাধীনতাবিরোধী মৌলবাদীর সবচেয়ে বড়ো শক্তি হচ্ছে তাদের মিথ্যাচার, ধর্মকে ব্যবহার করার জন্য তারা যেকোনো সময় যেকোনো ধরনের মিথ্যাচার করতে প্রস্তুত। ছোট একটা ব্যাপারকে ধর্মের নামে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে ফেলতে পারে, যে কোনো একটিকে 'ইস্যু' তৈরি করে রাজনৈতিক সুযোগ সন্ধানীরা একে অপরের ঘাড়ে কাঁঠাল ভেঙে খেতে শুরু করে। আমাদের দেশের রাজনৈতিক দল একেবারেই দায়িত্বশীল নয়, ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য বা ক্ষমতায় থাকার জন্য তারা দেশের সবচেয়ে বড়ো রাজাকার সবচেয়ে ঘৃণিত যুদ্ধাপরাধীকেও বুকে জড়িয়ে ধরতে পারে। কাজেই ঘুরেফিরে পুরো দায়িত্ব এসে পড়েছে আমাদের দেশের সত্যিকারের দেশপ্রেমিক শিল্পী-সাহিত্যিক, কবি-গায়ক এবং বুদ্ধিজীবীদের ওপর। তাদের ক্রমাগত দেশের সাধারণ মানুষের কাছে সত্য কথাটি বলে যেতে হবে। যে আদর্শ নিয়ে মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিল, দেশের ত্রিশ লাখ মানুষ যে স্বপ্নের জন্য প্রাণ দিয়েছিল সেই আদর্শ এবং স্বপ্নের কথা সবাইকে বলে যেতে হবে।

কাজেই দেশের সকল প্রগতিশীল দেশপ্রেমিক শিল্পী-সাহিত্যিক, কবি-গায়কের কাছে আমার বিনীত অনুরোধ, ঢাকা শহরের বাইরেও বের হয়ে আসুন। সাধারণ মানুষ আপনাদের ভালোবাসে, স্বাধীনতাবিরোধী দেশদ্রোহী ধর্মান্ধ মৌলবাদীদের অসংখ্য মিথ্যাচার আপনাদের আঁকা একটি ছবি দেখে, একটি কবিতা শুনে, একটি নাটক দেখে বা একটি গানের সুরে ধুলায় লুটিয়ে পড়বে। দেশের জন্য আপনাদের দায়িত্ব আছে—সে দায়িত্বটুকু আপনাদেরই পালন করতে হবে। ঢাকার বাইরে পুরো দেশ আক্রান্ত হলে কেমন করে চলবে? এ দেশ তো মৌলবাদীদের নয়—এ দেশ আমাদের।

—ভোরের কাগজ, ২৯ নভেম্বর ১৯৯৭।

তাসের ঘরে থাকবো না

মাঝে মাঝে মনে হয় আমরা একটা তাসের ঘরে বাস করছি। তাসের ঘর তৈরি করা খুব সহজ নয়—এর কোনো ভিত্তি থাকে না বলে এটি তৈরি করতে হয় খুব কৌশলে, একটি তাসের উপর অন্য তাসটি বসাতে হয় খুব সতর্ক হয়ে, একটু অসতর্ক হলেই পুরো ঘরটি হুড়মুড় করে পড়ে যায়। তখন আবার পুরোটি নতুন করে শুরু করতে হয়। খেলাচ্ছলে টেবিলের ওপর তাসের ঘর তৈরি করা এক কথা কিন্তু যদি মনে হয় আমাদের পুরো দেশটিই একটি তাসের ঘর, খুব সাবধানে সেটিকে দাঁড় করে রাখা হয়েছে, আমরা নড়তেচড়তে পারি না, খুব নিঃশ্বাস নিতে পারি না, একটা কথা বলার আগে দশবার ভাবতে হয়, দশ দিকে তাকাতে হয় তাহলে হঠাৎ করে নিজেদের খুব অসহায় মনে হতে থাকে। দেশ যদি একটা ঘরের মতো হয়, তাহলে তার আদর্শ হচ্ছে তার ভিত্তি। আদর্শের মধ্যে কোনো ফাঁকি থাকতে পারে না, আদর্শে কোনো জুয়াচুরি হয় না। অথচ স্বাধীনতার ছাব্বিশ বছর পরেও আমরা অবাক হয়ে দেখছি এই দেশের একেবারে মূল ভিত্তিতে কী ভয়ানক গোঁজামিল। মুক্তিযোদ্ধারা তাদের বুকের রক্ত দিয়ে এই দেশ স্বাধীন করেছে, অথচ চারদিকে তাকালে মনে হয় ব্যাপারটি যেন হঠাৎ করে ঘটে গেছে, ভুল করে ঘটে গেছে। যারা একদিন আক্ষরিকভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের জবাই করেছে তারা এখনো এই দেশে সদর্পে ঘুরে বেড়ায়, একটির পর একটি সরকার সেটি দেখে যায়, একটিবার একটি কথাও বলে না, এতো বড়ো ভণ্ডামি পৃথিবীর আর কোন দেশে আছে? একটি জাতি, একটি দেশ এর থেকে বড়ো আত্মপ্রবঞ্চনা আর কিভাবে করতে পারে?

আমরা একটি তাসের ঘরে আটকে পড়ে আছি—কথাটি আবার নতুন করে মনে পড়লো কয়েকদিন আগে। পুরানো কাগজ ঘাঁটাঘাঁটি করতে করতে হঠাৎ হাতে একটা কাগজ উঠে এলো, মিসেস জাহানারা ইমামের সাংবাদিক সম্মেলনের অনুলিখন। তিরানব্বইয়ের জানুয়ারি মাসে মিসেস জাহানারা ইমাম

নিউইয়র্কে এটা সাংবাদিক সম্মেলন করেছিলেন। আমি আমার জীবনে এই একটি সাংবাদিক সম্মেলনই দেখেছিলাম, সাংবাদিকেরা যে আসলে খুব নিরপেক্ষ নয় তারা যেটা বিশ্বাস করে সেটাই চেষ্টা-চরিত্র করে অন্যের মুখ থেকে বের করে আনতে চায় সেটা আমি সেদিন আবিষ্কার করেছিলাম। মিসেস জাহানারা ইমামের সাংবাদিক সম্মেলনটির অনুলিখন করেছিলাম আমি নিজেই। সেটি পড়তে পড়তে আমার আবার সেই দিনটির কথা মনে পড়ে গেলো। শেষ লাইনটি পড়ে আমি একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেছি, সেখানে লেখা রয়েছে, '...... যেদিন স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল করে গোলাম আযমের বিচার শুরু হয়ে যাবে সেইদিন আমি মনে করবো যে আমার কাজ কিছুটা শেষ হয়েছে এবং তখন হয়তো আমি কিছুটা লেখালেখির জগতে ফিরে যেতে পারবো।'

মিসেস জাহানারা ইমাম আর লেখালেখির জগতে ফিরে যেতে পারেননি। এই সাংবাদিক সম্মেলনের দেড় বছর পরে মিশিগানের একটি হাসপাতালে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ফেলেছিলেন। তার কাজ কিছুটা শেষ হয়েছে সেই সান্ত্বনাটুকুও তিনি নিয়ে যেতে পারেননি, স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল তৈরি হয়নি, গোলাম আযমের বিচারও শুরু হয়নি। শুধু যে বিচার শুরু হয়নি তাই নয়, বিচার শুরু হবে সেরকম আয়োজনও নেই। এইমাত্র কয়েকদিন আগে প্রধান বিরোধী দলের নেত্রী গোলাম আযমের সঙ্গে প্রকাশ্যে দেখা করেছেন। আমার বড়ো জানতে ইচ্ছে করে, এরকম সাক্ষাৎকারের সময় তারা কী নিয়ে আলোচনা করেন। বিরোধী দলের নেত্রী কি একটিবার জিজ্ঞেস করেছিলেন যে দেশকে ধ্বংস করার জন্য তারা সমস্ত শক্তি নিয়োগ করেছিল, যে দেশের সোনার সন্তানদের অবলীলায় হত্যা করেছিল, যে দেশের জাতীয় পতাকা পদদলিত করার জন্য হিংস্র হায়েনার মতো ছুটে গিয়েছিল, সেই দেশের মাটিতে দাঁড়িয়ে সেই বাতাসে নিঃশ্বাস নিতে কেমন লাগে? আমি নিশ্চিত, তাকে সেই প্রশ্ন করা হয়নি। আমাদের বাংলাদেশ টেলিভিশনে প্রধানমন্ত্রীকে একজন একটি ভিন্ন ধরনের প্রশ্ন করেছিল, এই দেশে ধর্মভিত্তিক সাম্প্রদায়িক রাজনীতি কি বন্ধ করা হবে? প্রশ্নটি প্রধানমন্ত্রী প্রায় হেসে উড়িয়ে দিলেন, তার কথা শুনে মনে হলো এটি একটি ছেলেমানুষি প্রশ্ন। কিন্তু প্রশ্নটি তো ছেলেমানুষি প্রশ্ন নয়, বাংলাদেশের ত্রিশ লক্ষ মানুষ বুকের রক্ত দিয়ে অনেকগুলো প্রশ্নের সঙ্গে তো এই প্রশ্নেরও উত্তর দিয়ে গিয়েছিল, এখন হঠাৎ করে এই প্রশ্নটি ছেলেমানুষি প্রশ্ন হলো কেন?

বাংলাদেশের স্বাধীনতার মতো কষ্টার্জিত স্বাধীনতা পৃথিবীতে খুব বেশি নেই। স্বাধীনতার পরবর্তী দুই যুগেরও বেশি সময়ের নানা ধরনের গণতান্ত্রিক, অগণতান্ত্রিক, আধাগণতান্ত্রিক, সামরিক, আধাসামরিক, এমনকি সরকারহীন শাসনের সময় নানা ধরনের রাজনৈতিক মতাদর্শ কখনো জোর করে, কখনো কৌশলে দেশের মানুষের মাথায় ঢোকানোর চেষ্টা করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধুকে অস্বীকার করার পর্বটি করা হয়েছে নির্লজ্জভাবে, সাম্প্রদায়িকতাটুকু শেখানো হয়েছে কৌশলে। টেলিভিশনে রাজাকার বলা নিষিদ্ধ ছিল। দেশে গণহত্যা করেছিল হানাদার 'বাহিনী'—পাকিস্তান কথাটুকু বলা যেতো না। এই বিচিত্র রকমের মস্তিষ্ক-প্রক্ষালনের ভিতরে থেকেও দেশের মানুষ যে কয়টি জিনিস একেবারে গোড়া থেকে এখন পর্যন্ত দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে এসেছে সেটি আমাদের মুক্তিযুদ্ধের আদর্শগত ভিত্তি। এই দেশের মানুষ একটি মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়ে দেশকে স্বাধীন করেছে, সেই স্মৃতিটুকু কখনো তারা বিস্মৃত হয়নি। যারা এই মুক্তিযুদ্ধের শত্রু তারা এর বিরোধিতা করতে পারে, এটিকে বিকৃত করতে পারে কিন্তু এটিকে অস্বীকার করতে পারে না। স্বাধীনতা যুদ্ধের সবচেয়ে যে ঘৃণ্যতম শত্রু সেই জামাতে ইসলামীর ছাত্র সংগঠনকেও আমি 'মহান মুক্তিযুদ্ধ' নিয়ে ভাষণ দিতে শুনেছি। স্বাধীনতার ছাব্বিশ বছরে আমরা অনেক চড়াই-উৎরাই পার হয়ে এসেছি, অনেক বিষয় নিয়ে অনেক ইচ্ছাকৃত বিতর্ক দাঁড় করানো হয়েছে, কিন্তু মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে দেশের মানুষের মনে কোনো সন্দেহ নেই। কাজেই দেশের সাধারণ মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্যতা পেতে হলে মুক্তিযুদ্ধের কথা বলতে হয়। যারা এর পক্ষের, তাদের বলতে হয়; যারা এর বিরোধী, তাদেরও বলতে হয়। এই দেশের মানুষ মুক্তিযুদ্ধকে পুরোপুরি গ্রহণ করেছে, সামাজিকভাবে গ্রহণ করেছে, রাজনৈতিকভাবে গ্রহণ করেছে, জাতিগতভাবেও গ্রহণ করেছে।

মহান মুক্তিযুদ্ধকে যদি আমরা গ্রহণ করে থাকি তাহলে যেই আদর্শের জন্য এই মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিল সেটিও গ্রহণ করতে হবে। ডিসেম্বর মাসে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করার জন্য, গলা কাঁপিয়ে বিবৃতি দেওয়ার জন্য এই মুক্তিযুদ্ধ হয়নি। মুক্তিযুদ্ধের ফসল হচ্ছে স্বাধীনতা। এই স্বাধীনতার শক্তি দিয়ে যদি স্বাধীনতার শত্রুদের রক্ষা করা হয়, লালন করা হয়, শক্তিশালী করা হয়, তাহলে স্বাধীনতার অপমান করা হয়, মুক্তিযোদ্ধাদের অবমাননা করা হয়। এই স্বাধীন

দেশে যদি স্বাধীনতা-বিরোধীদের বিচার করা না হয় সেটি হবে একটি ভয়ঙ্কর প্রবঞ্চনা, একটি নির্লজ্জ ভণ্ডামি। একটি সরকারের পর অন্য একটি সরকার সেই ভণ্ডামি করে যেতে পারে কিন্তু আমরা কেন সেটি সহ্য করবো?

৩

এদেশের স্বাধীনতাবিরোধীদের নাকি ক্ষমা করা হয়েছে। দেশ স্বাধীন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই ক্ষমা করা শুরু হয়েছে। 'ক্ষমা' কথাটির একটি সুনির্দিষ্ট অর্থ রয়েছে, যে কেউ যে কোনো মানুষকে ক্ষমা করতে পারে না। আমার ওপরে কেউ অবিচার করলে অন্য কেউ তাকে ক্ষমা করতে পারবে না। অনুতপ্ত অপরাধী আমার কাছে ক্ষমা চাইলে আমি তাকে ক্ষমা করবো।

বাংলাদেশে এই ব্যাপারটি ঘটেনি। এই দেশের স্বাধীনতা টেবিলে বসে আলোচনা করে কাগজে চুক্তি স্বাক্ষর করে হয়নি। এই দেশের স্বাধীনতা হয়েছে রক্তক্ষয় করে। যারা এই স্বাধীনতার বিরোধিতা করেছে তারা আলোচনার টেবিলে যুক্তিতর্ক দিয়ে বিরোধিতা করেনি, তারা বিরোধিতা করেছে রক্ত-মাংসের মানুষকে হত্যা করে, মায়ের বুক থেকে সন্তানদের কেড়ে নিয়ে, মেয়েদের সম্ভ্রম নষ্ট করে। কোনো সরকার এই অপরাধীদের ক্ষমা করতে পারে না, এদেরকে ক্ষমা করতে পারে শুধুমাত্র সন্তানহারা মায়েরা, সম্ভ্রম হারানো মেয়েরা। তার জন্য সেই সব অপরাধীদের নিজের অপরাধের কথা স্বীকার করে নতজানু হয়ে ক্ষমা চাইতে হবে। কিন্তু বাংলাদেশের স্বাধীনতাবিরোধীরা একটিবারও তাদের দোষ স্বীকার করেনি, ক্ষমা চাওয়া তো অনেক দূরের ব্যাপার। শুধু যে ক্ষমা চায়নি তাই নয়, তারা আস্ফালন করে বলেছেন, আমরা কোনো অপরাধ করিনি। ত্রিশ লাখ মানুষের গণহত্যায় সক্রিয় অংশ নেওয়া যদি অপরাধ না হয়, লাখ লাখ মেয়ের ওপরে পৈশাচিক নির্যাতন যদি অপরাধ না হয় তাহলে এই পৃথিবীতে 'অপরাধ' কী হতে পারে?

যারা কখনো অপরাধ করেছে বলে স্বীকার করেনি, যারা কখনো ক্ষমা চায়নি তাদেরকে কি ক্ষমা করা যায়? তাদেরকে ক্ষমা করে দেওয়া, অর্থাৎ বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় না করানোর একটিমাত্র অর্থ—আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকার করে নেওয়া, তারা আসলেই কোনো অপরাধ করেনি। আমি যখন পরবর্তী প্রজন্মের সামনে দাঁড়িয়ে মুক্তিযুদ্ধের কথা বলি, তাদের আত্মত্যাগের কথা, বীরত্বের কথা বলি তখন হঠাৎ করে আমাকে দ্বিধাগ্রস্তের মতো থেমে যেতে হয়; আমি অত্যন্ত

একটা সহজ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারি না। সত্যিই যদি মুক্তিযোদ্ধারা মহান হয়ে থাকে তাহলে তাদের হত্যাকারীরা এই দেশে এখনো সসম্মানে কেন বেঁচে আছে? গত দুই দশক আমরা এই একই ধরনের আরো লজ্জা নিয়ে বেঁচে ছিলাম। সংবিধানের মতো একটি মহান দলিলে ইনডেমনিটি বিলের মতো একটি কুৎসিত কলঙ্ক লেপন করে রেখেছিলাম। বঙ্গবন্ধুর মতো মানুষকে সপরিবারে হত্যা করে তাঁর আত্মস্বীকৃত খুনিকে এই দেশে সদম্ভে ঘুরে বেড়াতে দিয়েছিলাম। এই দুই লজ্জার অবসান ঘটেছে। এখনও এর মতো আরো একটি লজ্জার অবসান ঘটাতে হবে, এই দেশের মাটিতে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করতে হবে।

৪.

আমাদের দেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম এই দেশের ভিত্তিকে গড়ে দিয়েছিল— অত্যন্ত শক্ত ছিল সেই ভিত্তি, তার মাঝে এতটুকু খাদ ছিল না, এতটুকু ফাটল ছিল না, এতটুকু দুর্বলতা ছিল না। সেই শক্ত ভিত্তির প্রস্তরগুলো একটি একটি করে খুলে নেওয়া হয়েছে—প্রথম প্রস্তরটি অপসারণ করেছিল বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে গঠিত স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম আওয়ামী লীগ সরকার। দালাল অধ্যাদেশে স্বাধীনতাবিরোধীদের বিচার করার জন্য যে প্রসিকিউশন টিম তৈরি করা হয়েছিল সেটিকে কোনো রকম সহযোগিতা না করে বাতিল করে দেওয়া হয়েছিল। কেন দিয়েছিল? এই প্রশ্নের জবাব কে দেবে? বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার স্বাধীনতা সংগ্রামে তাদের নেতৃত্বের কথা গৌরবের সঙ্গে স্মরণ করে, আমরাও করি। স্বাধীনতার পরপর দেশদ্রোহী যুদ্ধাপরাধীদের ক্ষমা করে দেওয়ার সেই কাপুরুষতাকে আমরা ধিক্কার দিই, তাদেরকেও দিতে হবে। দেশের আদর্শের মাঝে কোনো অসঙ্গতি থাকতে পারবে না, ভুল করা হয়ে থাকলে সেই ভুল স্বীকার করে সংশোধন করতে হবে। দেশকে তার শক্ত ভিত্তির মাঝে উপস্থাপন করতে হবে।

বঙ্গবন্ধুর সরকারের আমলে দেশদ্রোহীদের ক্ষমা করার যে পর্ব শুরু হয়েছিল পরবর্তী সরকারগুলোতে সেই পর্ব পূর্ণমাত্রায় বিকশিত হতে থাকে। জিয়াউর রহমান রাষ্ট্রপতি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শাহ আজিজুর রহমানের মতো একজন কুখ্যাত দালালকে প্রধানমন্ত্রী করে ফেললেন। শুধু তাই নয়, আরো কিছু দালাল-রাজাকারকে মন্ত্রী বা সংসদ সদস্য হওয়ার ব্যবস্থা করে দেন, এই দেশে আবার

সাম্প্রদায়িক রাজনীতি করার ব্যবস্থা করে দিয়ে তিনি সম্ভবত দেশকে বহু বছর পিছনে ঠেলে দিয়ে দেশের সবচেয়ে বড়ো সর্বনাশ করে দিয়ে গেলেন। বাংলাদেশ যে ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়েছিল, বলা যেতে পারে তার পুরোটাই তিনি টেনে সরিয়ে দিলেন।

জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ স্বাধীনতার সময় পাকিস্তানে আটকে পড়া যেসব বাঙালি সীমান্ত পার হওয়ার সময় পাকিস্তান সেনাবাহিনীর হাতে ধরা পড়তো তাদের বিচার করে শাস্তি দেওয়ার দায়িত্বে ছিলেন। বাংলাদেশে এসে তিনি যে তার অসমাপ্ত বিচার কাজ সমাপ্ত করার চেষ্টা করেননি সম্ভবত সেজন্যই তার প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। তার শাসনামলে তিনি তার পুরোনো স্বাধীনতাবিরোধী দালাল-রাজাকার সহযোগীদের পুনর্বাসন করার কাজটি অত্যন্ত সুচারুভাবে শেষ করেছিলেন।

স্বাধীনতার ঠিক বিশ বছর পর নির্বাচনে জিতে খালেদা জিয়া বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করলেন, ক্ষমতায় এসেই তিনি জামাতে ইসলামীর সঙ্গে রাজনৈতিক একটা সম্পর্ক গড়ে তুললেন। জামাতে ইসলামী সম্ভবত প্রথমবার এ দেশে তাদের অবস্থান সম্পর্কে মোটামুটি নিশ্চিত হয়ে, গোলাম আযমকে—যে নাকি একজন পাকিস্তানের নাগরিক—তাদের আমির হিসেবে ঘোষণা করলো।

যে কাজটি দেশের প্রগতিশীল রাজনৈতিক দলগুলোর করার কথা ছিল তখন সেই কাজটি করার জন্য এগিয়ে এলেন আমাদের দেশের সাধারণ মানুষ। মিসেস জাহানারা ইমাম—যিনি একজন মা, গৃহবধূ এবং লেখিকা—দেশের মানুষকে মুক্তিযুদ্ধের ভিত্তিতে সংঘবদ্ধ করে ফেললেন। তিনি আমাদের দেশের কুটিল রাজনৈতিক কাজকর্মের মধ্যে থেকেও গণআদালতে গোলাম আযমের বিচার করলেন। সারা দেশের তরুণদের মধ্যে নতুন করে মুক্তিযুদ্ধের একটি চেতনা জাগিয়ে তুললেন। বলা যেতে পারে, পুরো দেশ যেন অন্ধকারের অতল গহ্বরের মাঝে ছুটে যাচ্ছিল হঠাৎ সেটি থমকে দাঁড়িয়ে আলোর চিহ্ন খুঁজে পেলো।

মিসেস জাহানারা ইমামের নেতৃত্বে জাতীয় সমন্বয় কমিটি যখন একদিকে নরঘাতক দেশদ্রোহীদের চিহ্নিত করে যাচ্ছেন ঠিক তখন আওয়ামী লীগ তাদের উদ্ধার কাজে এগিয়ে এলো। নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আন্দোলনে আওয়ামী লীগ জামাতে ইসলামীকে সঙ্গে নিয়ে আন্দোলন করে যেতে লাগলো। মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষের দল বলে যারা আওয়ামী লীগকে বিশ্বাস করে তাদের কাছে

হঠাৎ করে জামাতে ইসলামীর গ্রহণযোগ্যতা বেড়ে গেলো—একটি দেশের জন্য এর চাইতে বড়ো ক্ষতি কী হতে পারে?

ছিয়ানব্বইয়ের ১২ই জুনে নির্বাচনের মধ্য দিয়ে আওয়ামী লীগ দীর্ঘ একুশ বছর পর আবার ক্ষমতায় এসেছে। যারা মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষের মানুষ তাঁরা অনেকদিন পর তারা প্রথমবার সহজে নিঃশ্বাস নিতে পারছে। ক্ষমতায় এসেই সরকার অত্যন্ত চমৎকার কয়েকটি মানবিক কাজ করেছে তার একটি হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের আপনজনকে ডেকে তাদেরকে সম্মানিত করা। আমার মাকেও একদিন আমন্ত্রণ করে নিয়ে আরো অসংখ্য শহীদের স্বজনদের সঙ্গে তার হাতে একটি পদক তুলে দেওয়া হলো। সেই পদকে প্রথমবার বাংলাদেশ সরকার আমার বাবার স্মৃতির প্রতি সম্মান দেখিয়ে মুক্তিযুদ্ধে তার অবদানের কথা স্মরণ করেছে। এই পদকটি সম্ভবত অত্যন্ত স্বল্পমূল্যের একটি ধাতব ফলক, কিন্তু আমাদের কাছে তার মূল্য অনেক। ঘরের দেয়ালে ঝুলিয়ে রাখা সেই ধাতব ফলকটি দেখে আমার সন্তানেরা আমার মুক্তিযোদ্ধা পিতার গৌরবে গৌরবান্বিত হয়। আজ থেকে শত বছর পরে আমাদের বংশধরেরা এই পদকটি সযত্নে স্পর্শ করে তাদের না-দেখা পূর্বপুরুষকে স্মরণ করবে। জাতীয় পতাকার মাঝখানে লাল সূর্যটির দিকে তাকিয়ে ভাববে এই রক্তবর্ণের গাঢ় রঙটির জন্য যে ত্রিশ লক্ষ মানুষ বুকের রক্ত দিয়েছিল তার মধ্যে তাদের কোনো-এক পূর্বপুরুষও ছিল। মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের স্মরণ করার জন্য এই দেশকে কেন দুই দশক অপেক্ষা করতে হলো?

বছর ঘুরে আবার একটি বিজয় দিবস এসেছে। আমি নিশ্চিত এই বিজয় দিবস উপলক্ষে আমরা মহান মুক্তিযুদ্ধকে স্মরণ করবো। দেশের বড়ো বড়ো গুণীজন, দেশের নেতানেত্রী, মন্ত্রী-আমলারা মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে ভালো ভালো কথা বলবেন, মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মত্যাগের কথা স্মরণ করিয়ে দেবেন। কিন্তু এই স্মৃতিচারণ, সব সম্মান প্রদর্শন অশ্রু বিসর্জন প্রকৃতপক্ষে পুরোপুরি একটি অর্থহীন প্রক্রিয়া বলে মনে হয়, এক ধরনের ফাঁকা বুলির মতো শোনায়; কারণ যে সমস্ত যুদ্ধাপরাধী এই সব মুক্তিযোদ্ধাদের নৃশংসভাবে হত্যা করেছে, তাদের এখনো বিচার করা হয়নি। ঠিক যখন আমরা মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মত্যাগের কথা বলি, আমি নিশ্চিত, সেই সময়ে আক্ষরিক অর্থে স্বাধীনতাবিরোধী গোষ্ঠীর নেতা গোলাম আযম, একাত্তরে মালেক মন্ত্রিসভার শিক্ষামন্ত্রী আব্বাস আলী খান, আল বদর বাহিনীর নেতা ও সংগঠক মতিউর রহমান নিজামী, মুহাম্মদ কামরুজ্জামান, শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান এবং জিয়াউর রহমানের মন্ত্রিসভার

সদস্য আবদুল আলিম, পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সহযোগী দেলোয়ার হোসেন সাঈদী, এরশাদ সরকারের মন্ত্রী, বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ডে অভিযুক্ত মওলানা আবদুল মান্নান, এককালীন বামপন্থী নেতা পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর দালাল আনোয়ার জাহিদ, একাত্তরের জল্লাদ হিসেবে কুখ্যাত আবদুল কাদের মোল্লা এবং তাদের মতো আরো অনেকে কোনো নিরাপদ আশ্রয়ে অট্টহাসি হেসে বলছে, এই দেখো, তোমরা আমাদের এখনো স্পর্শ করতে পারনি।

সত্যিই আমরা তাদের স্পর্শ করিনি—অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি তাদের কাউকে কাউকে মন্ত্রিত্ব দিয়ে সম্মানিত করা হয়েছে। এইসব দেশদ্রোহী নরঘাতকদের অনেকে মৃত্যুর পর এই দেশের মাটিতে কবর দেওয়ার জায়গা পাচ্ছে না। একুশের বইমেলার সময় আমি এই লেখায় উল্লেখ করা মানুষগুলোর নাম জাতীয় গণতদন্ত কমিশনের রিপোর্ট থেকে নেওয়া। বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় জাতীয় মূত্রাগার এবং শৌচাগার খুলতে দেখেছি। রাষ্ট্রপতি স্বাধীনতাবিরোধী হওয়ার কারণে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে আমন্ত্রিত না হওয়ার উদাহরণও রয়েছে—কিন্তু এ সবই এক ধরনের সামাজিক অপমান। মানবতার বিরুদ্ধে জঘন্যতম অপরাধ করার কারণে সৃষ্টিকর্তা পরকালে তাদের যথোপযুক্ত শাস্তি দেবেন সেটি চিন্তা করে কেউ কেউ শান্তি পেতে পারেন কিন্তু তাদেরকে তার আগেই পৃথিবীর বিচারেও শাস্তি পেতে হবে। ধৈর্যহারা কিছু কিছু তরুণ আবার নতুন করে সশস্ত্র সংগ্রাম করে অসমাপ্ত মুক্তিযুদ্ধকে সমাপ্ত করে এইসব অপরাধীদের শাস্তি দেওয়ার কথা বলে কিন্তু আমরা অস্ত্রের শক্তি দিয়ে অপরাধের বিচার করতে চাই না। দেশের নতুন মুক্তিযুদ্ধ হবে, অর্থনৈতিক বন্ধন থেকে মুক্তির জন্য, অশিক্ষা কুশিক্ষা থেকে মুক্তির জন্যে, সাম্প্রদায়িকতার বিষ থেকে মুক্তির জন্য এইসব যুদ্ধাপরাধীর বিচার হবে আমাদের গণতান্ত্রিক নিয়মের ভিতরে, দেশের আইনের ভিতরে, আমাদের দেওয়া অধিকারের ভিতরে।

প্রায় দুই যুগ পরে আমরা একটি সরকার পেয়েছি যারা নিজেদেরকে মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষের শক্তি বলে বিশ্বাস করে। আমরাও বিশ্বাস করতে চাই। আমাদের বিশ্বাসকে সম্মান করে এখন এইসব যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করতে হবে।

মুক্তিযুদ্ধের আদর্শের যে শক্ত ভিত্তিতে এই দেশ সৃষ্টি হয়েছিল আমি সেই দেশে থাকতে চাই। ভিত্তিহীন আদর্শহীন গোঁজামিলে ভরা একটি তাসের ঘরে আমরা থাকবো না।

—ভোরের কাগজ, ১৫ ডিসেম্বর ১৯৯৭।

আমার কোচপানা জানবেন

আমি বাচ্চাদের জন্য কিছু লেখালেখি করেছি বলে বাচ্চারা মাঝে মাঝে আমাকে চিঠি লেখে (ভালো সাহিত্যিকেরা বাচ্চাদের জন্য লেখেন না—লিখলে তাঁদের শিশু সাহিত্যিক হিসেবে দুর্নাম হয়ে যায়!) কেউ যেন মনে না করে বাচ্চাদের চিঠিপত্র খুব নিরীহ। এই সেদিন একজন চিঠিতে লিখেছে, 'আপনি এটা কি লিখেছেন? পড়ে বমি এসে যায়।' তাই খামের ওপর কাঁচা হাতে ঠিকানা লেখা থাকলে আমি খুব ভয়ে ভয়ে খামটি খুলি। সেদিন এরকম একটি চিঠি এসেছে রাঙ্গামাটি থেকে। খামের ওপর কাঁচা হাতে লেখা তাই ভয়ে ভয়ে খামটা খুলেছি, ভিতরে দীর্ঘ চিঠি, সেটি শুরু হয়েছে এভাবে, 'আমার [illegible] অনেক কোচপানা জানবেন—'

আমি হঠাৎ করে থমকে গেলাম। 'কোচপানা' শব্দটি আমার অপরিচিত। যে বাচ্চা মেয়েটি চিঠি পাঠিয়েছে সে কিন্তু লিখেছে অসংকোচে, অবলীলায়, খুব সহজে, তার শব্দটি লিখতে একটুও দ্বিধা হয়নি। কিন্তু ছোট শব্দটি পড়ে আমার হঠাৎ নিজেকে কেমন জানি অশিক্ষিত, মূর্খ এবং খানিকটা নির্বোধ মনে হলো। একটি বাচ্চা যদি এতো সহজে একটি শব্দ লিখতে পারে তাহলে আমি কেন সেই শব্দটি জানবো না? কেন আমি আমার নিজের দেশের মানুষের মুখের ভাষা থেকে এতো দূরে থাকবো? এইটুকু একটা দেশ তার মাঝে এতো দূরত্ব কোথা থেকে এলো? সে একটি উপজাতীয় মেয়ে— সেটাই কি দূরত্ব?

আমার শৈশবের একটি চমৎকার অংশ কেটেছে রাঙ্গামাটি এবং বান্দারবানের পাহাড়ী অঞ্চলে। আমার বন্ধুবান্ধবের অনেকে ছিল উপজাতীয়। তাদের সম্ভবত চাকমা, মগ বা মারমা এরকমভাবে ভাগ করা যায় কিন্তু শৈশবে সেটা নিয়ে আমরা একবারও মাথা ঘামাইনি। তাদের কেউ কেউ আমাদের থেকেও ভালো বাংলা বলতো আবার কারো পেটে বোমা মারলেও

একটা বাংলা শব্দ বের হতো না। এসব নিয়ে আমাদের কখনো কোনো সমস্যা হয়নি, ক্লাস নামক ভয়াবহ ব্যাপারটি শেষ হয়ে যাওয়ার পর হঠাৎ করে আমাদের সব ব্যবধান কেটে যেতো। স্কুল ছুটির পর কতোদিন আমরা আমাদের বন্ধুদের সঙ্গে তাদের পল্লীতে ঘুরে বেড়িয়েছি। মাচার মতো বাসা, নিচে গরু, ছাগল, হাঁস-মুরগি, শূকর, উপরে মানুষ। কাছে গাছপালা, ফলের বাগান, বিশাল পেয়ারা গাছে টসটসে পাকা পেয়ারা—জীবনকে রীতিমতো স্বর্গ বলে মনে হতো। আমাদের স্কুলের শিক্ষকদের মাঝেও কেউ কেউ ছিলেন চাকমা, মগ বা অন্য কোনো উপজাতীয় (আজকাল পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয়দের মাঝে মগ না লেখে মারমা লেখছি, দুটি একই উপজাতির ভিন্ন নাম কিনা জানি না, এর মাঝে কোনো-একটি ব্যবহার করা শোভন বা নিয়ম কিনা সেটাও আমি জানি না। পাঠকদের কাছে আমার অজ্ঞতার জন্য ক্ষমা চাইছি)। স্কুলের শিক্ষকদের মাঝে আমার ব্যক্তিগত 'ফেবারিট' ছিলেন একজন মগ মহিলা, তিনি ছবি আঁকার ক্লাস নিতেন। কিছু একটি এঁকে নিলেই তিনি খুব খুশি হয়ে আমাদেরকে এক হাজার বা বারশ' নম্বর দিয়ে দিতেন। তার গলায় গলগণ্ড রোগ ছিল বলে তিনি প্রচলিত বিশ্বাসে নিশ্চয়ই রূপসী ছিলেন না কিন্তু আমাদের তাকে কখনো কুশ্রী মনে হয়নি।

রহস্যময় সেই অঞ্চলে মানুষ আর প্রকৃতি হাতে হাত ধরে বসবাস করতো। মানুষের মাঝে বিশেষ করে উপজাতীয় এবং অ-উপজাতীয়দের মাঝে ভেদাভেদ ছিল কিনা আমরা জানতাম না। ভিন্ন চেহারা, ভিন্ন ভাষা, ভিন্ন পোশাক, চালচলন-খাবার, কিন্তু মানুষটি যে হুবহু এক সেই ব্যাপারটি শৈশবে আমরা যতো সহজে আবিষ্কার করেছি অন্যরাও যদি করে ফেলতো কি চমৎকারই না হতো!

আমার বাবা সেখানে পুলিশে চাকরি করতেন। মাঝে মাঝে আরাকান থেকে ডাকাতেরা এসে হামলা করতো, বাবাকে তখন দীর্ঘদিনের জন্য পাহাড়ের দুর্গম অঞ্চলে তদন্ত করার জন্য যেতে হতো। তার ছবি তোলার শখ ছিল। পাহাড়ী মানুষের এবং প্রকৃতির অসংখ্য দুষ্প্রাপ্য ছবি তুলেছিলেন। তার লেখারও শখ ছিল তাই সেই দুর্গম অঞ্চলের ভ্রমণ কাহিনীতে সেখানকার নৈসর্গিক সৌন্দর্যের কথা লেখা ছিল। আজকাল যতো সহজে বই প্রকাশ করা যায় সেই সময়ে যদি সেটা এতো সহজ হতো তাহলে সেই লেখাগুলো দিয়ে চমৎকার কিছু প্রকাশনা করা

যেতো। স্বাধীনতা সংগ্রামে আমাদের বাসভবন লুট করার সময় সেসব হারিয়ে গেছে। আমি কিছু কিছু পড়েছিলাম, পাহাড়, নদী এবং উপজাতীয় সেই মানুষের সোজাসাপ্টা মাটির কাছাকাছি বেঁচে থাকার এতো চমৎকার একটা বর্ণনা ছিল যে, আমি ঠিক করে রেখেছিলাম বড়ো হয়ে সেখানে নিশ্চয়ই বেড়াতে যাবো। শৈশবের রহস্যময় চোখে সেই প্রকৃতির একটা রূপ ছিল, তারুণ্যের রঙিন চোখে সেটি কেমন দেখায় জানার বড়ো ইচ্ছে ছিল।

বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময়ে তিয়াত্তর কি চুয়াত্তর সালে হঠাৎ করে একবার পরীক্ষা পিছিয়ে গেলে আমরা তিন বন্ধু মিলে শৈশবের দেখা সেই পাহাড়ী অঞ্চলে বেড়াতে গিয়েছিলাম। বাবার লেখায় শঙ্খ নদী দিয়ে পাহাড়ের গহীনে উঠে যাওয়ার একটি বর্ণনা ছিল, ঠিক করলাম সেভাবেই যাবো। বান্দরবানে পৌঁছে খোঁজখবর নিয়ে হঠাৎ করে আবিষ্কার করলাম শৈশবের দেখা সেই চমৎকার সুন্দর পরিবেশের কোথায় জানি চিড় খেয়ে গেছে। এখন এলাকার সবাই আর এক মানুষ নয়— তারা পাহাড়ি এবং বাঙালিতে ভাগ হয়ে গেছে। তাদের ভিতরে যেন অবিশ্বাস এবং কোথায় জানি এক ধরনের টেনশন। আমরা তবুও নিরুৎসাহিত হলাম না, একটা নৌকা ভাড়া করে পাহাড়ি অঞ্চলের গহিনে উঠে গিয়েছিলাম। প্রকৃতি কিন্তু মানুষের মাঝে বিচ্ছেদের কথা জানে না, সে তার সমস্ত সৌন্দর্য নিয়ে সেখানে বিকশিত হয়েছিল। আমি পৃথিবীর যেখানেই গেছি, যখনই সুযোগ পেয়েছি প্রকৃতির কাছাকাছি যাওয়ার চেষ্টা করেছি, কিন্তু শঙ্খ নদী দিয়ে দুই পাহাড়ের মাঝে সেই অপূর্ব দৃশ্যটির কোনো তুলনা পাইনি।

এরপর অনেকদিন কেটে গিয়েছে, আমি আবার পাহাড়ি এলাকায় গিয়েছি প্রায় দুই দশক পরে, পঁচানব্বই সালে। আমার লেখা বাচ্চাদের একটা বই 'দীপু নাম্বার টু' চলচ্চিত্রায়িত হচ্ছে, শুটিং হবে রাঙ্গামাটিতে। একদিন বিকেলে শুটিং দেখতে গিয়েছি, পাহাড়ি একটা পথে উপন্যাসের কিশোর চরিত্ররা হাঁটছে, ক্যামেরাতে সেটা বন্দি করার প্রক্রিয়া চলছে। চলচ্চিত্রের নিয়মানুযায়ী একই জিনিস বারবার করা হচ্ছে, বিকেলের আলো শেষ হয়ে আসছে, সেটা নিয়ে সবার মাঝে উদ্বেগ।

আমাদের কাছাকাছি কিছু সশস্ত্র বিডিআর অসহিষ্ণু হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, বারবার এখান থেকে চলে যেতে বলছে, অন্ধকার হয়ে আসছে বিপদ হতে পারে।

কি নিয়ে বিপদ হতে পারে জিজ্ঞেস করার পর তারা ভয়ঙ্কর সব গল্প বলতে শুরু করলো—পাহাড়ি মানুষের নৃশংসতার গল্প।

বিকেলের পড়ন্ত আলোতে রাস্তার মাঝে দাঁড়িয়ে আমি দুই পাশে তাকালাম, খাড়া পাহাড় উঠে গিয়েছে, সেখানে নিবিড় অরণ্য। সেই অরণ্যে নাকি সশস্ত্র পাহাড়িরা লুকিয়ে আছে, আমাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখছে, সুযোগ পেলেই আমাদের আক্রমণ করবে।

হঠাৎ করে আমার একাত্তরের কথা মনে পড়লো। একাত্তরে পাকিস্তান সেনাবাহিনী যে যুক্তি দেখিয়ে যে ভূমিকা পালন করেছিল আমাদের দেশের সেনাবাহিনী কি এখানে সেই একই যুক্তি দেখিয়ে একই ভূমিকা পালন করছে? সেনাবাহিনীর সঙ্গে অবাঙালি দালালদের দেখে আমরা যে ঘৃণা অনুভব করেছি, পাহাড়ে লুকিয়ে থাকা উপজাতীয়রা কি আমার প্রতি সেই একই ঘৃণা অনুভব করছে? নিজের দেশকে শত্রুর হাত থেকে উদ্ধার করার জন্য মুক্তিবাহিনীর যে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে হাতে অস্ত্র তুলে নিয়েছিল, এই পাহাড়িরা কি সেই একই ভালোবাসায় নিজের মাটির জন্য, নিজের অধিকারের জন্য হাতে অস্ত্র তুলে নেয়নি? পার্থক্যটা কোথায়? কোন কাগজের ঘোষণায়? কোন দপ্তরে কোন ফাইলে লিখে রাখা কোন কাগজে? কোন মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্তে? একাত্তর সালে শত্রুর অত্যাচারে এই দেশের এক কোটি মানুষ দেশ ছেড়ে চলে গিয়েছিল। কার অত্যাচারে পাহাড়ি এলাকার হাজার হাজার মানুষ দেশ ছেড়ে চলে গিয়েছে? কতো দুঃখে মানুষ মাতৃভূমি ছেড়ে চলে যায়— সেটা আমাদের থেকে ভালো করে কোন জাতি জানে?

ফিরে এসে ব্যাপারটা আমি ভালো করে বুঝতে চাইলাম, কে কার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে? কেন করছে? কতো মানুষ মারা গিয়েছে? কে মেরেছে? কাকে মেরেছে? কেন মেরেছে? কতো মানুষ দেশ ছাড়া হয়েছে? কেন হয়েছে?

বিচিত্র ব্যাপার হলো আমি খুঁজে পেতে কোথাও কোনো তথ্য পেলাম না। কোনো বইপত্র নেই, লেখালেখি নেই, কোথাও কোনো আলোচনা নেই, কারো কাছে এ ব্যাপারে এতোটুকু তথ্য নেই। সমস্ত দেশ পুরো ব্যাপারটি সম্পর্কে পুরোপুরি অজ্ঞ। আমার হঠাৎ দুই যুগ আগের একটি ঘটনার কথা মনে পড়লো।

আমি সবেমাত্র যুক্তরাষ্ট্র গিয়েছি। আমাদের মতো বিদেশী ছাত্রদের নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে নানা ধরনের অনুষ্ঠান হচ্ছে। তখন একজন পাকিস্তানী ছাত্রের সঙ্গে

পরিচয় হলো। আমি বাংলাদেশের শুনে সে জিব দিয়ে চুকচুক শব্দ করে বললো, "কি চমৎকার একটা দেশের মানুষ ছিলাম, খামোকা দেশটা ভেঙে গেলো।"

"খামোকা? তুমি জানো কেন দেশটা ভেঙেছে?"

সে একটু অবাক হয়ে আমার দিকে তাকালো, মনে হলো আমার কথায় সে ভারি অবাক হয়েছে। আমি বললাম, "তোমার দেশের মিলিটারিরা আমার দেশের ত্রিশ লাখ লোককে মেরেছে। লাখ লাখ মেয়েকে রেপ করেছে। এক কোটি মানুষ দেশ ছাড়া হয়েছে—"

"কি বলছো তুমি?" সে আকাশ থেকে পড়লো, "তোমার দেশে মানুষ মারা হয়েছে? আমি উল্টোটা শুনেছি। বাঙালিরা বিহারিদের মেরেছে। ওদেরকে বাঁচানোর জন্য কোথাও কোথাও—"

আমি অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইলাম, পৃথিবীর জঘন্যতম গণহত্যার কথা সেই হত্যাকারী দেশের মানুষেরা জানে না? জিজ্ঞেস করলাম, "তুমি জানো না, তোমার দেশের মিলিটারিরা আমাদের দেশে কি করেছে?"

সে মাথা নাড়লো, "না, জানি না। কেমন করে জানবো? সত্যি মেরেছে?"

"হ্যাঁ।"

"তোমার পরিচিত কাউকে মেরেছে?"

"হ্যাঁ, আমার বাবাকে।"

ছেলেটা এক ধরনের আঘাত পেয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইলো, সে প্রথম এই হত্যাকাণ্ডের কথা শুনছে। পাকিস্তান সেনাবাহিনী ইতিহাসের জঘন্যতম হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে গোপনে, তাদের দেশবাসীর অগোচরে।

এরকম কিছু কি ঘটেছে আমাদের দেশে? আমাদের সেনাবাহিনীও কি হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে আমাদের অগোচরে? মেয়েদের নির্যাতন করেছে? মা ও শিশুকে গৃহহারা করেছে? বাড়িঘর জ্বালিয়ে দিয়েছে?

আমি অনেক খুঁজে খুঁজেও কোনো তথ্য খুঁজে পেলাম না। প্রথমবার সেই তথ্য আমার চোখে পড়লো ২ ডিসেম্বরের খবরের কাগজে, সেখানে পার্বত্য চট্টগ্রামের ঐতিহাসিক ঘটনাপঞ্জী ছাপানো হয়েছে। সেটা পড়ে আমি অবিশ্বাস্য কিছু তথ্য জানতে পারলাম। ১৯৭৭ সালের ২৯ মে স্থানীয় সেনাবাহিনীর উপর শান্তিবাহিনী বড়ো ধরনের একটা হামলা চালানোর পর সেখানকার প্রতি একজন উপজাতীয়ের জন্য পাঁচজন করে সেনাবাহিনীর লোক হাজির করা হয়েছিল। একই বছর ডিসেম্বরের ২৬ তারিখ জেনারেল মঞ্জুর উপজাতীয়দের উদ্দেশ্যে সরাসরি হুমকি উচ্চারণ করে বলেছিলেন, "আমরা তোমাদের চাই না। তোমাদের যেখানে খুশি যেতে পারো। আমরা শুধু তোমাদের এলাকা চাই।" ১৯৮০ সালের ২৫ মার্চ স্থানীয় সেনাবাহিনীর কমান্ডার বৌদ্ধ মন্দিরে চাকমাদের একটা সভা আহ্বান করে তাদের ওপর গুলি চালিয়ে প্রায় ৩০০ জনকে হত্যা করে। অ-উপজাতীয়রা এলাকার বৌদ্ধ মন্দির এবং চাকমা বসতিগুলোতে হামলা চালায়। ১৯৮৬ সালের জুলাই মাসে শান্তিবাহিনী অ-উপজাতীয় জনগণের ওপর বিচ্ছিন্ন দুটি হামলা চালায়, বাঙালি অধিবাসীরা প্রতিশোধ হিসেবে চাকমা এলাকায় লুটতরাজ করে, প্রাণভয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের ৫০ হাজারের বেশি উপজাতি ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে সীমান্ত পার হয়ে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে পালিয়ে যায়।

খবরের কাগজের ইতিহাস দীর্ঘ, আমি নিশ্চিত—প্রকৃত ইতিহাস আরো অনেক বেশি দীর্ঘ এবং নির্মম। যুদ্ধ খুব ভয়ঙ্কর ব্যাপার, যখন দুই দল একজন আরেকজনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে তখন মানবতার পুরো ব্যাপারটি অদৃশ্য হয়ে যায়, সেটি অপসারিত হয় কিছু পরিসংখ্যান দিয়ে। সেই পরিসংখ্যানের পিছনের করুণ ইতিহাস কেউ খুঁজে দেখে না।

পার্বত্য চট্টগ্রামে কি ঘটেছে এ দেশের মানুষ সেটা জানতো না— তাদের স্পষ্ট করেই জানানো হয়নি, এই দেশের নাগরিক হিসেবে সেটা আমাদের জানার অধিকার ছিল। ২ ডিসেম্বর খবরের কাগজে যেটুকু ছাপা হয়েছে সেটুকু পড়ে আমি শিহরিত হয়েছি, সেখানে মানবতার বিরুদ্ধে ভয়ঙ্কর অপরাধ করা হয়েছে। শান্তিবাহিনী পাহাড়ি উগ্রপন্থীদের সঙ্গে সরকারের সামরিক আধা সামরিক পুলিশ এবং বাঙালিদের সংঘাতে উভয় পক্ষের প্রায় বিশ হাজার নারী-পুরুষ এবং শিশু প্রাণ হারিয়েছে। পুরো পার্বত্য এলাকার বর্তমান জনসংখ্যা মাত্র দশ লাখ, তার মাঝে বিশ হাজার মানুষকে হত্যা করার অনুপাতটি বাংলাদেশের একাত্তরের সাত কোটি মানুষের মাঝে ত্রিশ লাখ মানুষকে হত্যা করার সমান।

এই সম্পূর্ণ অর্থহীন অমানবিক নৃশংস হত্যাকাণ্ড বন্ধ করার জন্য একটি শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। চুক্তিটির খুঁটিনাটি যাই হোক না কেন—আমার ধারণা ছিল যুদ্ধরত দুই দল যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য প্রস্তুতি নিয়েছে, সবাই সেটিকে স্বাগত জানাবে। কিন্তু ব্যাপারটি সেভাবে ঘটলো না। শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার

আগেই ঘোষণা দেওয়া থাকলো, যেদিন শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হবে সেদিন থেকেই দেশে অশান্তি শুরু হবে। শান্তিচুক্তির ভিতরে কি হয়েছে সেটি নয়, শান্তিচুক্তিটিতেই আপত্তি। শেষ পর্যন্ত যখন শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হলো তখন অভিযোগ এলো, এতে সংবিধান লঙ্ঘিত হয়েছে। যারা অভিযোগ এনেছে তারা নিজেরাও কি সেই কমিটির সদস্য ছিল না—চুক্তিটি লেখার সময় সেই ব্যাপারটি দেখিয়ে দিলে কি ব্যাপারটি সহজ হতো না? সত্যি যদি সংবিধান লঙ্ঘিত হয় সেই চুক্তিকে সংশোধন করা যেতে পারে। কিন্তু দেশের মানুষেরা নিজেরা নিজেদের বিরোধ মিটিয়ে শান্তি স্থাপন করতে চাইছে, সেই পদ্ধতিটিকে কি অভিনন্দন জানানো যায় না? যেখানে মানুষের প্রাণ নিয়ে কথা হয় সেখানে রাজনীতির ঊর্ধ্বে যাওয়া কি দেশের মানুষ আশা করতে পারে না?

এ দেশে অনেক রক্তক্ষয় হয়েছে, আমরা আর রক্তক্ষয় দেখতে চাই না। আমরা নিজেদের মাঝে আর বিভেদ দেখতে চাই না। যে ছোট মেয়েটি আমাকে ভালোবাসা জানিয়েছে সে আমাদের মতো একজন, আমার মেয়ে থেকে তাকে আমি ভিন্ন করে দেখবো না। এখানে 'তারা' এবং 'আমরা' নেই। এখানে সবাই 'আমরা'।

এইটুকু ছোট একটা দেশকে আর কতোভাবে আমরা ভাগাভাগি করবো?

—ভোরের কাগজ, ১৮ ডিসেম্বর ১৯৯৭।

পঁচাত্তরের বীজ

আমার সামনে একটি ছাত্র বসেছিল, আমি যে বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ করি সে সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগের একজন বড়ো নেতা। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, "বঙ্গবন্ধুকে কে হত্যা করেছিল?"

ছেলেটি থতমত খেয়ে গেলো। প্রশ্নটি মনে হয় ঠিক বুঝতে পারলো না, ঠিক কী বলবে সেটা নিয়ে আমতা আমতা করছে। তখন আমি তাকে বললাম, "না, ফারুক-রশীদ বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করেনি। তারা শুধু ট্রিগার টেনেছে। বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করেছ তোমরা—ঠিক তোমাদের মতো মানুষেরা।"

ছেলেটি আমার দিকে হতচকিত হয়ে তাকিয়ে রইলো।

আমি ছেলেটিকে এই ধরনের একটা রূঢ় কথা বলেছিলাম। কারণ আমি একটা তদন্ত কমিটির সদস্য হিসেবে আবিষ্কার করেছি, এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা 'জয় বাংলা' এবং 'জয় বঙ্গবন্ধু' শ্লোগান দিতে দিতে অস্ত্র হাতে প্রতিপক্ষকে আক্রমণ করেছে, তাদের নির্যাতন করেছে, তাদের ঘর পুড়িয়ে দিয়েছে, তাদের যাবতীয় জিনিসপত্র লুট করেছে। বাংলাদেশে আমার সবচেয়ে প্রিয় মানুষ বঙ্গবন্ধু—তাঁর অবমাননা আমার জন্য সহ্য করা খুব কঠিন।

ঘটনাটি শুরু হয়েছিল প্রায় দশ মাস আগে—ফেব্রুয়ারির ১৯ তারিখে। হঠাৎ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের আবাসিক হলে একটা বড়ো গোলযোগ হলো। এই গোলযোগগুলোকে যদিও 'সন্ত্রাসী' নামের একটা নিরীহ শব্দ দিয়ে প্রকাশ করা হয় কিন্তু ঘটনাগুলো মোটেও নিরীহ নয়। এগুলো খুন-জখম-রাহাজানি-চুরি-ডাকাতি জাতীয় অপরাধ। পৃথিবীর সকল সভ্য দেশে খুন-জখম-রাহাজানি-চুরি-ডাকাতির শাস্তির জন্য পুলিশ রয়েছে, বিচারের ব্যবস্থা আছে, এই সব অপরাধে দশ বারো বছর জেল হতে পারে, ফাঁসি হতে পারে। ইনডেমনিটি আইন দিয়ে আমাদের সংবিধান হত্যাকারীদের রক্ষা করে এসেছিল বলে আমরা বহুদিন সভ্য সমাজে মুখ দেখাতে পারিনি। ছাত্রদের রক্ষা করার জন্যও ঠিক সে রকম একটি অদৃশ্য ইনডেমনিটি আইন রয়েছে। এই অদৃশ্য ইনডেমনিটির কারণে

ছাত্ররা খুন-জখম-রাহাজানি-চুরি-ডাকাতি করলেও দেশের প্রচলিত আইনে তাদের বিচার করা হয় না। ১১ ফেব্রুয়ারির ঘটনাটিতে গুলিবর্ষণ এবং তার প্রতিক্রিয়া হিসেবে অস্ত্র ব্যবহার, অগ্নি সংযোগ, শারীরিক নির্যাতন, লুটতরাজ, শিক্ষকদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার—এই ধরনের গুরুতর ব্যাপার থাকার পরেও পুলিশ তার কোনো দায়িত্ব গ্রহণ করলো না, দায়িত্বটি এসে পড়লো বিশ্ববিদ্যালয়ের উপরে। এমনিতেই নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ের অল্প কিছু শিক্ষকের অসংখ্য দায়িত্ব পালন করার পর নিঃশ্বাস ফেলার সময় নেই, তারপর তদন্ত নামক অত্যন্ত নিরানন্দ, মোটামুটি অর্থহীন এবং ভয়ঙ্কর ঝুঁকিপূর্ণ কাজটির দায়িত্ব আমাদের কারো নিতে ইচ্ছে করে না, কিন্তু তবুও একরকম জোর করে আমাকে আহ্বায়ক করে কয়েকজন শিক্ষককে নিয়ে একটি তদন্ত কমিটি তৈরি করে দেওয়া হলো।

কী ঘটেছে সে সম্পর্কে প্রাথমিক একটা ধারণা করার জন্য, সে রাতে ছাত্রদের আবাসিক হলে ছিল সে রকম একজন ছাত্রকে আমি ডেকে পাঠালাম। ছাত্রটি এসে প্রায় কেঁদে ফেলে বললো, "স্যার, আপনি আমাকে এ কী বিপদে ফেললেন?"

"বিপদ? কিসের বিপদ?"

"আমাকে কে প্রটেকশন দেবে?"

আমি অবাক হয়ে বললাম, "কেন? কী হয়েছে?"

"আপনি তদন্ত কমিটির আহ্বায়ক।"

"কিন্তু তুমি তো সাক্ষী দিতে আসনি, তদন্ত এখনো শুরু হয়নি। আমি তোমাকে ডেকেছি কী হয়েছে জানতে।"

সে মুখ শক্ত করে বললো, "তাতে কিছু আসে যায় না। বাইরে খবর হয়ে গেছে আমি আপনার কাছে এসেছি।"

আমি অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইলাম।

ঘটনার তদন্ত শুরু হওয়ার পর আমি আমাদের দেশের ছাত্র রাজনীতির নতুন আরো একটি দিক আবিষ্কার করলাম—পুরোপুরি ভায়োলেন্স দিয়ে নিয়ন্ত্রিত সেটি বিচিত্র এক রাজনীতি। দেশ, আদর্শ বা সমাজের সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই। ছোট একটা গণ্ডীর মাঝে লোভ, ক্ষমতা, আধিপত্য বিস্তার এবং ব্যক্তিগত হিংসার জন্য আদিম শক্তি প্রয়োগের ব্যাপার।

আমরা কয়েকজন শিক্ষক মিলে যে তদন্তটি করেছিলাম সেটি একটি গোপনীয় প্রতিবেদন। যে সমস্ত ছাত্ররা নিজেদের নিরাপত্তার কথা চিন্তা না করে আমাদের সামনে সাক্ষী দিয়েছে তাদের পরিচয় গোপন করে রাখার জন্য তার কিছু প্রকাশ করার অধিকার আমার নেই। কিন্তু তদন্ত রিপোর্টে ব্যবহৃত হয়নি—সে রকম একটি-দুটি ঘটনার কথা উল্লেখ না করে আমি পারছি না।

একদিন একজন পাংশুমুখে আমার সঙ্গে দেখা করতে এলো। আমার সামনে বসে কাঁপা গলায় বলল, "আমি সে রাতের ঘটনার সাক্ষী দিতে এসেছি।"

"বল, কী বলবে।"

ছেলেটি কাঁপা গলায় বললো, "স্যার, আসলে আমার বলার কিছু নেই। আমাকে সবাই মিলে এখানে মিথ্যা কথা বলার জন্য পাঠিয়েছে। কিন্তু স্যার, আমি আপনার সঙ্গে মিথ্যা কথা বলতে পারবো না।"

আমি সস্নেহে তার দিকে তাকিয়ে রইলাম। সে বললো, "বাইরে সবাই আমার জন্য অপেক্ষা করছে। আমি কিছুক্ষণ আপনার এখানে বসে থাকি?"

"বসে থাক।"

সে কিছুক্ষণ বসে থেকে আমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে উঠে গেলো। ভীত শঙ্কিত সেই ছাত্রটি সেদিন আবার নতুন করে মানুষের প্রতি আমার বিশ্বাস নতুনভাবে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছিল।

দ্বিতীয় ঘটনাটি একটু অন্যরকম। ১১ ফেব্রুয়ারি রাতের সেই সন্ত্রাসী ঘটনার সঙ্গে জড়িত একজন গোপনে আমার সঙ্গে দেখা করে প্রকৃত ঘটনার একটি নিখুঁত বর্ণনা দিয়ে গেলো। যেহেতু সে কাগজে লিখে নাম স্বাক্ষর করতে রাজি নয়, তাই তার এই মৌখিক স্বীকৃতি প্রকৃত অর্থে তদন্তের কোনো কাজে আসে না। তবে সন্ত্রাসী ঘটনার সঙ্গে জড়িত সেই ছাত্র নেতার শেষ বাক্যটি আমার মনে গেঁথে গেলো। সে বিদায় নেওয়ার সময় আমি তাকে বললাম, "আমরা তদন্ত প্রায় শেষ করে এনেছি, আজ-কালের মাঝেই রিপোর্ট জমা দেবো।"

ছেলেটি একগাল হেসে বললো, "স্যার, আপনারা আমাদের কিছু করতে পারবেন না।"

আমি তার হাসি মুখের দিকে তাকিয়ে শিউরে উঠলাম। হঠাৎ করে মনে হলো—এমনি করে নিশ্চয়ই একদিন পঁচাত্তরের বীজ বপন করা হয়েছিল।

পঁচাত্তরের ১৫ আগস্ট যখন বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হয়েছিল তখন তিনি ছিলেন নিঃসঙ্গ এবং একাকী। তিনি যে ভালোবাসা নিয়ে দেশের মানুষের মুখের দিকে তাকাতেন, স্বাধীনতার কয়েক বছরের মাঝেই তার রাজনৈতিক দল এবং তার অঙ্গ সংগঠনে সেই ভালোবাসার সব চিহ্ন মুছে গেলো। তৎকালীন আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগ, যুবলীগ বা অন্যান্য অঙ্গ সংগঠন জনবিচ্ছিন্ন একটি স্বৈরতান্ত্রিক দলের মতো হয়ে মানুষের ক্রোধ এবং আক্রোশের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছিল। সারা দেশের অসংখ্য অন্যায়, অবিচার, স্বার্থপরতা আর হৃদয়হীনতার দায়ভার বঙ্গবন্ধুকে এককভাবে যিশুখ্রিস্টের মতো বহন করতে হয়েছিল।

দেশের সত্যিকার শত্রুরা ট্রিগারে হাত দিয়ে অপেক্ষা করে ছিল। বঙ্গবন্ধুর মতো একজন মানুষকে হত্যা করার মতো দুঃসাহস তাদেরকে তৈরি করে দিয়েছিল তার নিজের দলের মানুষেরা। এতোদিন পর আবার আমি যখন চারপাশে তাকাই, আমার মনে হয় আবার সেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটতে চলেছে। সারা দেশের কোথায় কী ঘটছে আমি জানি না। কিন্তু এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনাগুলো যদি দেশের অবস্থাকে খানিকটা প্রকাশ করে, তাহলে আমাদের দীর্ঘশ্বাস ফেলা ছাড়া আর কিছু করার নেই।

যদিও ছাত্র নেতাটি হেসে আমাকে বলেছিল, "আপনারা আমাদের কিছু করতে পারবেন না"—কিন্তু আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে তাদের ভবিষ্যৎ বাণীটি ভুল প্রমাণিত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে একের পর এক সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর সকল শিক্ষক একত্রিত হয়ে উপাচার্যকে ব্যাপারটি শক্ত হাতে নিষ্পত্তি করার অনুরোধ করেছেন। তদন্ত কমিটির রিপোর্ট বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করা হয়, বিশ্ববিদ্যালয়ে তালা ঝোলানো হয়েছে। তারপরও শৃঙ্খলা কমিটি গত দেড় বছরের নানা ধরনের সন্ত্রাসী ঘটনার জন্য তৈরি তদন্ত কমিটির রিপোর্টগুলো বিবেচনা করে দলমত নির্বিশেষে সবার জন্য অপরাধের গুরুত্ব অনুযায়ী শাস্তির সুপারিশ করেছে। সেই শাস্তির সুপারিশ সিন্ডিকেটে উপস্থাপন করা হয়েছে এবং সিন্ডিকেট সেই সুপারিশটিকে অনুমোদন করেছে। খবরের কাগজে সেই শাস্তির বর্ণনা প্রকাশিত হয়েছে। সেখানে বিভিন্ন ঘটনায় শাস্তিপ্রাপ্ত ছেলেদের ছাত্রদল এবং ছাত্রলীগের কর্মী হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে, কিন্তু তাদের একটি বড় অংশ প্রকৃতপক্ষে দলত্যাগী ছাত্র—তাদেরকে 'ছাত্রদল' এবং 'বর্তমানে ছাত্রলীগ' এভাবে পরিচয় করিয়ে দিলে সত্যের আরো কাছাকাছি যাওয়া যেতো।

গত ২৩ তারিখ সিন্ডিকেট দোষী ছাত্রদের জন্য শাস্তির অনুমোদন করেছে-তথ্যটি প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের গুটিকতক ছাত্র মিলে একটি ভয়ঙ্কর অবস্থার সৃষ্টি করে ফেলে। ঘটনাক্রমে আমি সেদিন অপরাহ্নে ঢাকা রওনা দিয়েছি। কুয়াশার কারণে ফেরি চলাচল বন্ধ ছিল বলে সারারাত ফেরিঘাটে বসে কুয়াশায় ঢাকা মেঘনার অপূর্ব সৌন্দর্য উপভোগ করেছি। ভোরবেলা খবরের কাগজ কিনেছি খুব কৌতূহলে, এর আগের দিন বাংলাদেশ বিমানের একটি প্লেন রানওয়েতে ল্যান্ড না করে হাওরে নেমে পড়েছে, তার কী কারণ জানার কৌতূহল। এই প্লেনটিতে আমি অনেকবার যাতায়াত করেছি, সেটার জন্য কেমন যেন মায়া পড়ে গিয়েছিল।

প্লেনের বৃত্তান্ত শেষ করার আগেই আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি খবরে আমার চোখ পড়লো। সিন্ডিকেটের শাস্তি দেওয়ার সিদ্ধান্তের কথা প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ে অরাজকতা সৃষ্টি হয়েছে। গুলি-ককটেল-বোমাবর্ষণের সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রলীগের ছেলেরা মাননীয় উপাচার্য এবং আমাকে আর কখনো বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করতে দেবে না বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ঢাকা পৌঁছে সিলেটে যোগাযোগ করে আরো খবরাখবর জানতে পেলাম। আমাদের বাসার সামনে বোমা-ককটেল ফাটানো হয়েছে, আগুন জ্বালানো হয়েছে, টেলিফোন লাইন কেটে দেওয়া হয়েছে, বার বার এসে আমাদের খোঁজ করা হচ্ছে। সেই একাত্তরে শিক্ষকদের 'খোঁজ করা' শুরু হয়েছিল, তখন খোঁজ করতো জামাতে ইসলামীর সাহায্যপুষ্ট বদর বাহিনী—তাদের অনেককে রায়ের বাজারের বধ্যভূমিতে পাওয়া গেছে, এখন খোঁজ করছে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকারের রাজনৈতিক দলের অঙ্গ সংগঠন। যারা আসছে তারা আমার ছাত্র, ব্যাপারটি বিশ্বাস করা কঠিন। নিজের দেশে, নিজের বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গনে, নিজের ছাত্রছাত্রীদের মাঝে আমার আর কোনো নিরাপত্তা নেই— ব্যাপারটির মাঝে কোথায় জানি খুব দুঃখের একটা ব্যাপার রয়েছে।

একদিন পর খবরের কাগজে আরো কিছু তথ্য ছাপা হলো। তার মাঝে যেটি সবচেয়ে ভয়ঙ্কর সেটি হচ্ছে, শাস্তিপ্রাপ্ত ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি মাইক্রোবাস জোর করে ছিনিয়ে নিয়ে সেটিতে চেপে ঢাকা এসেছে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করার জন্য।

আমি রাজনীতি ভালো বুঝি না, কিন্তু এটুকু বুঝি যে অস্ত্র ব্যবহার, জখম, লুটতরাজ, অগ্নি সংযোগ এই ধরনের অপরাধে শাস্তি পাবার পর বিশ্ববিদ্যালয়ে

ত্রাস সৃষ্টি করে, বেআইনিভাবে মাইক্রোবাস ছিনিয়ে ঢাকায় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে চলে আসার মতো ঘটনা সম্ভবত শুধুমাত্র এই দেশেই ঘটতে পারে। প্রধানমন্ত্রী তাদের সঙ্গে দেখা করেছেন কিনা আমি জানি না, দেখা করে থাকলে তাদেরকে কী বলেছেন সেটাও জানি না। একটি দেশের প্রধানমন্ত্রী অনেক বড়ো ব্যাপার, তার সঙ্গে সাধারণ একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের আমার মতো সাধারণ একজন শিক্ষকের সম্ভবত কখনোই দেখা হবে না। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে যদি দেখা হতো, আমি করজোড়ে বলতাম, "বঙ্গবন্ধু যে রকম জানতেন না, আপনিও হয়তো জানেন না—এই দেশে শাঁচতরের বীজ বপন করা হয়েছে। আপনি সেটাকে পানি দিয়ে সিঞ্চিত করবেন না। বিশ্বাস করুন —আমরা এ দেশ থেকে চিরতরে পাঁচাত্তরের বীজ উৎপাটন করতে চাই। আমাদের সাহায্য করুন।"

সিন্ডিকেটের যে সভায়, যে সিদ্ধান্তের খবরে বিশ্ববিদ্যালয়কে তছনছ করে দেওয়া হয়েছে সেই একই সভায় আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল, সেটি খবরের কাগজের মুখ দেখেনি, যদিও আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য সেটি ছিল আরো অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ— বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হবে ফেব্রুয়ারির ২৮ তারিখ, সেদিন বাংলাদেশের সবচেয়ে শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি, রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ এই বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্পণ করবেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক-কর্মকর্তারা দীর্ঘদিন থেকে এই দিনটির জন্য অপেক্ষা করে আছেন, কিন্তু এটি খবরের কাগজে একটি সংবাদ হতে পারলো না। সাফল্যের সংবাদ সন্ত্রাসের গ্লানিমায় চাপা পড়ে গেলো।

এরপর কী হবে আমরা জানি না, তবে কী করতে চাই আমরা সেটি খুব ভালো করে জানি। যখন একজন মানুষের দেয়ালে পিঠ ঠেকে যায়, তখন সামনে এগিয়ে যাওয়া ছাড়া আর কিছু করার থাকে না। দেয়ালে আমাদের পিঠ ঠেকে গেছে। এখন আমাদের আর পেছানোর উপায় নেই, আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। সরকার তার রাজনৈতিক দল, তাদের অঙ্গ সংগঠন সবাই মিলেও যদি বিশ্ববিদ্যালয়কে তছনছ করে দেয়, তবু আমাদের দাঁতে দাঁত চেপে সামনে এগিয়ে যেতে হবে। অসহিষ্ণু এবং উদ্ধত ছাত্র রাজনীতির যে রূপটি এখন প্রকাশিত হয়েছে সেটি দেখে মনে হয়, আমাদের সত্যি সত্যি রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের কথাটি ভেবে দেখার সময় এসেছে— রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে এখন পুরো জাতিকে সম্মিলিতভাবে দাবি জানাতে হবে তারা যেন তাদের ছাত্র সংগঠনগুলোকে বিলুপ্ত করে দেয়। সেটি শুরু করার

সবচেয়ে দেখানোর প্রকৃত সুযোগ রয়েছে আমাদের প্রধানমন্ত্রী মাননীয়া শেখ হাসিনার। যদি সত্যি তিনি জাতির স্বার্থে এটি শুরু করেন, আমি নিশ্চিত, বাংলাদেশের ইতিহাস নতুন করে রচিত হবে।

সত্যিই যদি রাজনৈতিক দলগুলো তাদের ছাত্র সংগঠনগুলোকে অবলুপ্ত করে দেয়, তাহলে হঠাৎ করে মহাপরাক্রমশালী সন্ত্রাসী ছাত্ররা একদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে আবিষ্কার করবে তারা রাতারাতি সাধারণ একেকজন ছাত্রে পরিণত হয়ে গেছে। তাদের আবার বই নিয়ে ক্লাশে আসতে হবে, ল্যাবরেটরিতে কাজ করতে হবে। তারা আবিষ্কার করবে হাতে অস্ত্র তুলে নেওয়ার সময় তাদের পাশে কেউ নেই, অস্ত্র ব্যবহার করার পর তাদেরকে রক্ষা করারও কেউ নেই।

আমরা, শিক্ষকেরা তখন তাদের জন্য অপেক্ষা করবো। যারা আমাদেরকে আঘাত করার জন্য উদ্যত অস্ত্র হাতে নিয়ে আসছে, তাদের জন্যও অপেক্ষা করবো। তারা বিশ্বাস করুক আর নাই করুক— আমরা সত্যিই ভালোবাসা নিয়ে তাদের জন্য অপেক্ষা করবো।

★ ★ ★

গতবারের লেখায় আমি 'কোচপানা' বলে একটি শব্দ ব্যবহার করেছিলাম, অনেকে সেই শব্দটির অর্থ জানতে চেয়েছেন। যে ছোট মেয়েটি আমাকে চিঠি লিখেছিল তার কাছে আমি জানতে পেরেছি—কোচপানা শব্দটির অর্থ ভালোবাসা।

—ভোরের কাগজ, ২৯ ডিসেম্বর ১৯৯৭।

'মাইনাসে মাইনাসে প্লাস'

এই লেখার শিরোনাম দেখে পাঠকদের মনে হতে পারে যে আমি নিশ্চয়ই দেশ, সমাজ বা রাজনীতির কোনো একটি গুরুগম্ভীর বিষয়ের অবতারণা করতে যাচ্ছি। যেখানে মহৎ কিছু অর্জনের জন্য একটি অন্যায়কে প্রতিহত করা হয় অন্য একটি অন্যায় দিয়ে। আসলে সেরকম কিছু নয়, আমি বলতে যাচ্ছি সেই আদি ও অকৃত্রিম মাইনাসে মাইনাসে প্লাসের কথা, যেখানে ছাত্ররা অংক করতে গিয়ে শেষে একটা নেগেটিভ সংখ্যাকে অন্য একটি নেগেটিভ সংখ্যা দিয়ে গুণ করলে গুণফল হয় পজেটিভ। এতো বিষয় থাকতে কেনো এই পুরানো বিষয়টি টেনে আনছি সেটা একটু পরেই স্পষ্ট হবে।

আমি যখন যুক্তরাষ্ট্রে ছিলাম তখন আই ট্রিপল-ই'র একটা সম্মানিত ম্যাগাজিনে একজন বড়ো ইঞ্জিনিয়ারের একটা লেখা পড়েছিলাম। তিনি যা লিখেছিলেন তার মর্মার্থ হলো, যুক্তরাষ্ট্রে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর লেখাপড়া একেবারে যাচ্ছেতাই। তাদের পাঠ্যসূচি মান্ধাতা আমলের, ল্যাবরেটরিগুলোতে যন্ত্রপাতি অপ্রতুল এবং পুরানো, শিক্ষকেরা সত্যিকারের বিজ্ঞান কিংবা প্রযুক্তি থেকে বিচ্ছিন্ন। ছাত্রদেরকে পড়ানো হয় সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয় বিষয় অত্যন্ত অযত্নে। এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষাব্যবস্থা থেকে যেসব ছাত্র বের হয় তাদের সম্পর্কে শুধুমাত্র একটি কথাই বলা যায়, সেটি হচ্ছে তারা নিশ্চয়ই অসম্ভব মেধাবী এবং বুদ্ধিমান; তা না হলে এই 'জঘন্য' পদ্ধতির মাঝে টিকে থাকা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। যারা এই পদ্ধতির মাঝেও শেষ পর্যন্ত টিকে থাকতে পারে তখন তাদের নিয়ে কার্যক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়, ছাত্রছাত্রীরা তখন সত্যিকার অর্থে শিখতে শুরু করে। আই ট্রিপল-ই'র ম্যাগাজিনের সেই ইঞ্জিনিয়ার বলেছেন, কর্মক্ষেত্রে ব্যবহার করার জন্য তখন এই সকল ছাত্রছাত্রীকে সবকিছু শিখিয়ে নিতে হয়। তারা চালাকচতুর বলে সবকিছু বেশ তাড়াতাড়ি শিখে নিতে পারে।

যুক্তরাষ্ট্রের সেই ডাকসাইটে ইঞ্জিনিয়ারের লেখা পড়ে আমার একটা খুব বড় উপকার হয়েছে। আমি আজকাল আর আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষা নিয়ে অভিযোগ করি না। আমি যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার সঙ্গে মোটামুটি পরিচিত, আমার ধারণা ছিল তাদের আন্ডার গ্রাজুয়েট শিক্ষার মান চমৎকার। কিন্তু সেই শিক্ষাব্যবস্থা নিয়েই যদি এতো বড়ো বড় কথা বলা যায় তাহলে আমরা আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার সমালোচনা করি কোন মুখে? তাহলে কি আমাদের ধরেই নিতে হবে যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাটা আসলে একটা ছাকনির মতো? অসংখ্য ছাত্রছাত্রীদের ভেতর থেকে ছেঁকে ছেঁকে ভালো ভালো ছাত্র-ছাত্রীদের বের করাই এর প্রধান কাজ? সেসব ছাত্রছাত্রীদের বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশেষ কিছু শেখানো হয় না—যা শেখানো হয় তা অপ্রয়োজনীয় এবং অর্থহীন। সত্যিকার কাজ শুরু করে তারা প্রয়োজনীয় জিনিসটুকু শিখে নেয়?

আই ট্রিপল-ই'র ম্যাগাজিনে যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো নিয়ে এ ধরনের একটা লেখা বের হয়েছে বলেই যে আমাদের তার কথাগুলো পুরোপুরি বিশ্বাস করতে হবে সেটা কিন্তু সত্যি নয়। তবে ব্যাপারটি একটু ভেবে দেখার বিষয় এবং অস্বীকার করার উপায় নেই যে তার মাঝে খানিকটা সত্যতা রয়েছে। আমরা যদি আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো নিয়ে বিবেচনা করি আমার মনে হয় আমরা যে ছাকনির কাজটাও খুব ভালোভাবে করছি সেটা দাবি করতে পারবো না। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা এবং পরীক্ষা নেওয়ার পুরো ব্যাপারটিতে আমরা সত্যিকার অর্থে কখনো মেধার খোঁজ করি না। শিক্ষায় পুরো ব্যাপারটাকে আমরা প্রশ্ন এবং উত্তর এই দুই ভাগে ভাগ করে এনেছি। ছাত্ররা কিছু প্রশ্নের উত্তর শেখে, ভালো ছাত্রদের জন্য তার সংখ্যা বেশি, খারাপ ছাত্রদের জন্যে সংখ্যাটি কম। পরীক্ষার হলে ভাগ্যের একটা ব্যাপার থাকে—প্রশ্ন 'কমন' পড়ে গেলে পরীক্ষা ভালো হয়ে যায়, 'কমন' না পড়লে খারাপ। একটি ছাত্রের সত্যিকারের মেধা যাচাইয়ের কোনো সুযোগ নেই।

উন্নত বিশ্বের ভালো একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর তুলনা করা ঠিক নয়। বেশিরভাগ সময়েই একটি বিশ্ববিদ্যালয় চালানোর প্রয়োজনীয় বিশেষ কিছুই আমাদের নেই। কিন্তু এর সঙ্গে সঙ্গে আরেকটি জিনিস সবাইকে লক্ষ্য করতে হবে। একটি ছাত্রকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার জন্য যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন ছাত্রটি কিন্তু তার এক ক্ষুদ্র ভগ্নাংশও খরচ করে না, সত্যি কথা বলতে কী, ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয়ের বেতন হিসেবে যে

পরিমাণ অর্থ নেয় সেটা তুলতে তার থেকে বেশি টাকা খরচ হয়ে যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার জন্য প্রকৃতপক্ষে কী পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয় সেটা আজকাল প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ছাত্র বেতন দেখলে খানিকটা আন্দাজ করা যায়। আমি মোটামুটি নিশ্চিত বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবকদের যদি নিশ্চয়তা দেওয়া যায় সময় মতো তাদের সন্তানদের পড়াশোনা শিখিয়ে পাস করিয়ে দেওয়া হবে— তাহলে অভিভাবকরা ছাত্র বেতন হিসেবে আরো বেশি টাকা দিতে খুশি হয়ে রাজী হবেন। আমাদের দেশের কোচিং সেন্টারগুলো হচ্ছে তার সবচেয়ে বড়ো প্রমাণ, অভিভাবকেরা এই সব কোচিং সেন্টারের পিছনে কী পরিমাণ অর্থ ব্যয় করেন সেটি একটি দেখার মতো বিষয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশোনা করতে যেহেতু তেমন কোনো অর্থ ব্যয় হয় না সে কারণে তাড়াতাড়ি পড়া শেষ করার জন্য ছাত্রদের তেমন গরজও দেখা যায় না। বিনামূল্যে কিছু একটা ধরিয়ে দিলে আমরা সেটা অবহেলা করে ফেলে দিই, অথচ একই জিনিস গাঁটের পয়সা খরচ করে কিনলে সেটা ঘরে এনে সাজিয়ে রাখি—এখানেও মনে হয় অনেকটা সেই একই অবস্থা।

উচ্চ মাধ্যমিক পাস করে যেসব ছাত্রছাত্রী সবেমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে আমি তাদের ক্লাস নিয়ে একটা বিচিত্র জিনিস আবিষ্কার করেছি। কোনো একটি জিনিস তাদের পড়ানোর পর তারা এক ধরনের অস্বস্তি বোধ করতে থাকে, তারা সব সময় জানতে চায় এই বিষয়টিতে প্রশ্নটা কিভাবে করা হবে। প্রশ্নটি জেনে গেলেই তারা উত্তরটা প্রস্তুত করে সেটা মুখস্থ করে ফেলে। পরীক্ষায় হুবহু সেই প্রশ্নটি দেওয়া হলে তারা নিখুঁতভাবে তার উত্তর লিখে ফেলবে কিন্তু প্রশ্নটা একটু অন্যভাবে লিখলেই পরীক্ষার হলে আক্ষরিক অর্থে 'মহামারী' হয়ে যায়। এটি অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি আমাদের দেশের প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থাটি একেবারে নিয়ম করে আমাদের ছেলেমেয়েদের চিন্তা করার ক্ষমতাটিকে পুরোপুরি ধ্বংস করে দিয়েছে। আমাদের পড়াশোনার পুরো ব্যাপারটি এখন মুখস্থ করার ক্ষমতার মাঝে সীমাবদ্ধ হয়ে এসেছে। পরীক্ষায় যেটি আসবে সেটি যেন আগে থেকে জানা থাকে— সেটাই হচ্ছে পড়াশোনার উদ্দেশ্য। অথচ এরকমটি হওয়ার কথা ছিল না, একটি জিনিস শেখার একমাত্র উদ্দেশ্য সেই জ্ঞানটুকু ব্যবহার করে অন্য একটি কাজ করা, কিন্তু সেটি কোথাও আর দেখা যায় না। পরীক্ষাতে তো নয়ই, ক্লাসরুমেও না, সৃজনশীলতাকে এখানে রীতিমতো অপরাধ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। আমি অসংখ্য ঘটনার কথা জানি যেখানে ছাত্রছাত্রীরা প্রশ্নের উত্তর নিজের মতো করে

দিয়েছে বলে তাদের শাসন করা হয়েছে। হবু চন্দ্রের দেশ খোঁজার জন্য সত্যি কি আর খুব দূরে যেতে হয়?

আমাদের ছেলেমেয়েরা যে চিন্তা করতে ভুলে গেছে আমি তার একটা প্রমাণ দেই। নেগেটিভ সংখ্যাকে নেগেটিভ সংখ্যা দিয়ে গুণ করলে সেটি যে পজিটিভ সংখ্যা হয় সেটি আমাদের ছাত্রছাত্রীরা খুব কম বয়সেই শিখে যায়। এমন কোনো ছাত্রছাত্রী নেই যারা অংক করতে গিয়ে এটি ব্যবহার করেনি। কিন্তু আমি বাজি ধরে বলতে পারি এই সহজ জিনিসটার প্রকৃত অর্থ তারা কখনো চিন্তা করে দেখেনি। যদি তাদেরকে বলা হয়, তারা তাদের জীবনে দেখেছে বা ব্যবহার করেছে এরকম একটি জিনিসের উদাহরণ দিক যেটি 'মাইনাসে মাইনাসে প্লাস' হয়েছে, তারা সেই উদাহরণ দিতে পারবে না। আমার কথা যারা অবিশ্বাস করেন তারা কোনো একটি ছাত্র বা ছাত্রীকে জিজ্ঞেস করে দেখতে পারেন।

ছাত্রছাত্রীরা এই সহজ গাণিতিক ব্যাপারটির একটি উদাহরণ যদি দিতে না পারে সেজন্য কিন্তু তাদেরকে দোষ দেওয়া যাবে না। এ ধরনের একটি ব্যাপারে যে প্রশ্ন করা যায় কিংবা সেটা নিয়ে চিন্তা করা যায় তাও কখনো তাদেরকে বলা হয়নি। (আমি নিশ্চিত এর পরেও কেউ কেউ ভেবে ভেবে এর উদাহরণ বের করে ফেলবে—আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা যতোই চেষ্টা করুক তার মাঝেও কেউ না কেউ তার পুরো সৃজনশীলতা নিয়ে বেঁচে থাকে। সেটাই আমাদের মত শিক্ষকদের সবচেয়ে বড়ো সান্ত্বনা।)

২.

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে আমাদের যে-সমস্যাটি নিয়ে খুব বেশি মাথা ঘামাতে হয় না কিন্তু যেটি আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় একটি খুব বড়ো সমস্যা—সেটি হচ্ছে নকল। নকল যে শুধুমাত্র আমাদের দেশের সমস্যা তা সত্যি নয়, পৃথিবীর সব দেশেই কম-বেশি এ রকম সমস্যা রয়েছে, সেটি সামলানোর জন্য সবাই চেষ্টা করে যাচ্ছে, অনেক কিছু ধুরন্ধর ছাত্ররাও নিত্য নতুন পথ বের করে যাচ্ছে। তবে আমাদের দেশে নকল সমস্যাটি যতো জটিল এবং যতো প্রকট সেরকম আর কোথাও নয়। আমি একজন নাট্যকর্মীকে চিনি যার বাবা পরীক্ষায় নকল করার সময় একজনকে ধরেছিলেন বলে নকলবাজ ছেলেটি ছুরিকাঘাত করে তাকে মেরে ফেলেছিল। নকল করা এখন এদেশে একটি অন্যায় কাজ নয়। মনে হয় এটি এক ধরনের অধিকার।

আমাদের দেশে নকল করার প্রবণতা এতো বেশি তার কারণ খুব সহজ— পরীক্ষায় যে সকল বিষয় লিখতে হয় তার উত্তর নকল করে লেখা সম্ভব। শুধু তাই নয় পরীক্ষার আগে আগে নকল করাকে সাহায্য করার জন্য ছোট ছোট গাইড বই বের হয়, খুব সহজেই যেন সেগুলো লুকিয়ে পকেটে করে নেওয়া যায়। কিন্তু ব্যাপারটি একটু অন্য রকম হতে পারতো, পরীক্ষায় এমন প্রশ্ন করা সম্ভব যার উত্তর নকল করে দেওয়া সম্ভব নয়, সেই সব প্রশ্নের উত্তর পৃথিবীর কোথাও লেখা নেই এবং একজন পরীক্ষার্থী শুধুমাত্র ভেবে ভেবে তার সম্ভাব্য উত্তর লিখতে পারে। এ ধরনের একটি ব্যাপার ঘটলে কী চমৎকার একটি ব্যাপার ঘটতো। পরীক্ষায় রচনা হিসেবে 'নৌকা ভ্রমণ' না হয়ে যদি আসতো 'নিউটনের যদি একটা কম্পিউটার থাকতো' তাহলে একটি ছাত্র বা ছাত্রীর সৃজনশীলতা, ভাষার ওপরে দখল, গুছিয়ে লেখার ক্ষমতা কী চমৎকারভাবেই না যাচাই করা যেতো। এটি তো এমন কিছু দুঃসাধ্য ব্যাপার নয়, পৃথিবীর অনেক জায়গাতেই তো এভাবেই পরীক্ষা নেওয়া হয়। আমরাও কী রাতারাতি সবকিছু পাল্টানোর চেষ্টা না করে ধীরে ধীরে সেদিকে যেতে পারি না? সত্যি সত্যি যদি পরীক্ষায় পাওয়া নম্বর সেই ছাত্র কিংবা ছাত্রীর মেধার একটি পরিচয় হতো সেটি কী চমৎকার একটি ব্যাপার হতো না?

৩.

বেশ কিছুদিন আগে দুজন লোক আমার সঙ্গে দেখা করতে এলো। তারা শহরে একটা কোচিং সেন্টার খুলতে যাচ্ছে, আমাকে দিয়ে সেটা উদ্বোধন করাতে চায়। তাদের অনুরোধটি শুনে আমি চমকে উঠলাম। শহরে পকেটমারের একটা ইনস্টিটিউট খোলা হলে এবং আমাকে সেটি উদ্বোধন করতে বললেও আমি সেভাবে চমকে উঠতাম। আমি দুজন কর্মকর্তাকে অবশ্যি সেটা বলতে পারলাম না, উল্টোপাল্টা কথাবার্তা বলে এবং লিখে আমি ইতিমধ্যে অনেক শত্রু তৈরি করে রেখেছি—তাদের সংখ্যা আর বাড়াতে চাইলাম না। ভদ্রভাবে এবং বিনয়ের সঙ্গে তাদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করার পরেও তারা চিনে জোঁকের মতো আমার পিছনে লেগে রইলো। আমি অবাক হয়ে আবিষ্কার করলাম কোচিং সেন্টার তৈরি করে জ্ঞান নামক ধরা-ছোঁয়ার বাইরের জিনিসটাকে কেটে-কুটে ছোট ছোট টুকরা করে ঠিক সময়ে উগড়ে দেওয়ার জন্য পানিতে গুলে খাইয়ে দেওয়া যে এক ধরনের সামাজিক অপরাধ হতে পারে— কর্মকর্তারা

সেটি জানেন না! ক্রিকেট খেলায় কোচিং হতে পারে, সাঁতার বা কুস্তিতে কোচিং হতে পারে কিন্তু শিক্ষার কোচিং কেমন করে হয় সেটি এখনো আমার কাছে রহস্য। নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ নিয়ে একটা নির্দিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় বা কলেজে ভর্তি করিয়ে দেওয়ার চুক্তি যে একটি অন্যায় চুক্তি হতে পারে সেটা কি কেউ কখনো ভেবে দেখেছে? বিভিন্ন বোর্ডে স্ট্যান্ড করা ছাত্রছাত্রীদের ছবি ছাপিয়ে প্রতি বছর কোচিং সেন্টারের যেসব বিজ্ঞাপন ছাপা হয় তবে পিছনের কাহিনী কেউ কি কখনো উদঘাটন করার চেষ্টা করেছেন?

৪.

আমাদের দেশের বড়ো একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ একটি বিভাগের প্রধান আমাকে তাদের ডায়েরিটা দেখিয়ে বলেছিলেন, "এই দেখেন, আমাদের একেবারে নতুন যেসব লেকচারার তাদের সবার বাসায় টেলিফোন আছে। অথচ আমাদের পুরোনো অনেক প্রফেসরদের বাসায় এখনো টেলিফোন নেই।"

আমি ভুরু কুঁচকে তার দিকে তাকালাম। তিনি হেসে বললেন, "আমাদের দেশে পড়াশোনার ব্যাপারটি বড়োলোকদের জন্য একচেটিয়া হয়ে গেছে। পরীক্ষায় ফার্স্ট-সেকেন্ড হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক যারা হতে পারে তারা আজকাল সবাই বড়ো লোকের ছেলেমেয়ে!"

আমাকে এর আগে এভাবে কেউ দেখিয়ে দেয়নি, কিন্তু ব্যাপারটি যে সত্যি হতে পারে আমি নিজেও সেটা অনুমান করেছিলাম। কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ না পেলেও অনেক অর্থ থাকলে এখনো বাইরে গিয়ে কিংবা প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করা যায়। আমাকে প্রায় পাঁচ ছয় বছর আগে একজন শিক্ষাবিদ একই সমস্যার কথা বলেছিলেন সম্পূর্ণ অন্য কারণে। তিনি মাধ্যমিক পরীক্ষার পাঠ্য বিজ্ঞান বইটি আমার হাতে দিয়ে বলেছিলেন, এই বইটি প্রাইভেট টিউটর ছাড়া ছাত্রছাত্রীরা নিজে নিজে পড়তে পারে না। যাদের প্রাইভেট টিউটর রাখার ক্ষমতা নেই তাদের কী হবে?

সমস্যাটি গুরুতর এবং মানবিক। একটি দরিদ্র দেশে পড়াশোনা যদি শুধুমাত্র বিত্তশালীদের মাঝে সীমাবদ্ধ হয়ে যায় সেটি দেশের একটি বড়ো ক্ষতিও বটে। মেধা শুধু বিত্তশালীদের মাঝে সীমাবদ্ধ থাকে না, সবার মাঝেই সমানভাবে ছড়িয়ে থাকে। শুধু বিত্তশালীদের মেধা যদি বিকশিত হয় অন্যদের সম্ভাবনা অঙ্কুরেই বিনষ্ট করে দেওয়া হয়, সেটা তো শুভ হতে পারে না।

৫.

আমাদের দেশে নতুন শিক্ষানীতি আসছে, আমরা যতোদূর জানি সেখানে দেশের শিক্ষার অনেক সমস্যার সমাধানের কথা বলা হয়েছে। আমরা আশা করছি, এই শিক্ষানীতি এবং সরকারের সদিচ্ছা মিলে শিক্ষাব্যবস্থা মাথা তুলে দাঁড়াবে। যতোদিন সেটা না হচ্ছে ততোদিন ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক, অভিভাবক মিলে আমাদের দেশের সোনার টুকরো ছেলেমেয়েদের সৃজনশীল হতে উৎসাহিত করতে হবে। তাদের চিন্তা করতে শেখাতে হবে। সমস্যার মুখোমুখি হয়ে তার সমাধান বের করতে উৎসাহী করতে হবে। মস্তিষ্ককে শাণিত করতে হলে তাকে ব্যবহার করতে হয়, চিন্তা করার জন্য তো সমস্যার কোনো অভাব নেই।

যেমন : পৃথিবীর সব মানুষকে যদি গাদাগাদি করে একটা বর্গাকৃতি বাক্সে ঢোকানো হয় তার আকার কতো বড়ো হবে? পৃথিবীর প্রাণীজগৎ ধ্বংস হয়ে আবার যদি গোড়া থেকে প্রাণের বিকাশ হয়, আবার কি মানুষের জন্ম হবে? কোনো বস্তুর পরিমাণ সীমিত হয়ে তার পৃষ্ঠদেশ কি অসীম হতে পারে? কম্পিউটার কি কখনো মানুষের মতো বুদ্ধিমান হতে পারবে? মানুষের ক্লোন করা হলে সত্যিকারের সমস্যাটি কী হতে পারে?

৩১ ডিসেম্বর মাঝরাতে বিয়ারের ক্যান হাতে নিয়ে রাস্তায় নৃত্য করার তরুণ-তরুণী পাওয়া খুব সহজ, কিন্তু চিন্তা করতে ভালোবাসে সেরকম তরুণ-তরুণীই তো আমাদের বেশি দরকার। দেশের শিক্ষাব্যবস্থা যদি এগিয়ে না আসে তাহলে আমাদের নিজেদেরই এগিয়ে আসতে হবে। তারুণ্যের শক্তিকে অপচয় করার মতো বড়ো অপরাধ আর কিছু হতে পারে না।

—ভোরের কাগজ, ১৭ জানুয়ারি ১৯৯৮।